॥ প্রথম অধ্যায় ॥

॥ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

(সংক্ষিপ্ত জীবন- ইতিহাস)

প্রথম অধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় :
সংক্ষিপ্ত জীবন- ইতিহাস

॥ জন্ম ও পারিবারিক পটভূমি ॥

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আবির্ভূত হলেন সেইকালে, যখন ভারতের ইতিহাসে জাতীয় জীবনের ধ্যান ধারণায় গভীর পরিবর্তনের সুরটি ধ্বনিত হচ্ছিল স্বাধীনতার কামনাকে কেন্দ্র করে। ঊনবিংশ শতকের শেষাংশ এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগ ভারত ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জন হিসাবে চিহ্নিত। তখন প্রবাহিত হচ্ছিল নতুন জীবনাদর্শ অনুপ্রেরিত রাজনৈতিক কর্মসাধনায় প্রচণ্ড বেগবান গতিধারা। যদিও তৎকালীন রাজনৈতিক তৎপরতার প্রাণস্পন্দন তারাশঙ্করের জন্মভূমিতে প্রবলভাবে অনুভূত হয়নি, তথাপি শাসকসম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ তাঁদের কর্মধারা ও আচরণের মধ্যে বহু পূর্ব হতেই একটি সুরে প্রবল প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করেছিল। পুরাতন যুগের সামন্ততান্ত্রিক ক্ষমতা প্রভাবিত সংস্কৃতি তখন নানাবিধ নবযুগীয় চিন্তাধারা এবং কর্মপ্রচেষ্টায় প্রাবল্যে ঈষৎ কম্পমান। এরই মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেন তারাশঙ্কর বীরভূম জেলায় লাভপুর গ্রামে ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ অর্থাৎ ২৪শে জুলাই ১৮৯৮ সালে। তাঁর জন্ম সময়টি হ'ল – সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বক্ষণ অর্থাৎ উষাকাল।

তারাশঙ্করের পিতার নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। তাঁর পিতামহ হলেন দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রপিতামহ রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩০৫ সালের ৭ই মাঘ তারিখে বৈদ্যনাথ ধামের নির্মাল্য দিয়ে তারাশঙ্করের অন্নপ্রাশনের অনুষ্ঠান হয়। তাঁর সজ্ঞান মনের ওপর তাঁর পিতৃদেব ও মাতার প্রভাব ছিল সর্বাধিক। এ প্রসঙ্গে তাঁর পিসীমার নাম উল্লেখও অবশ্য করণীয়। তাঁর নামকরণে পারিবারিক শাক্ত সংস্কৃতির প্রভাব প্রত্যক্ষ। বিদ্যানুরাগ, সাহিত্যানুরাগ, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি চেতনা, সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা, নব কাল চেতনা প্রভৃতি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন এবং সমস্ত জীবন ধরে সেগুলোকে লালন করেছিলেন। তারাশঙ্করের জীবনের সংগ্রামের দিনগুলোতে তাঁর পিতার উজ্জ্বল প্রেরণা এবং আশীর্বাণী অন্ধকার রাত্রে ধ্রুবতারার মত পথনির্দেশক ছিল। পিতার এক চমৎকার গ্রন্থসংগ্রহ ছিল। পিতার এই গ্রন্থাগারের মধ্যে লুকিয়ে ছিল তাঁর সাহিত্যিক প্রেরণার উৎস। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও আধুনিক

বাংলা সাহিত্য ও পত্র পত্রিকায় ঐশ্বর্যের মধ্যে কিশোর তারাশঙ্কর তাঁর মানসিক ক্ষুধা পরিতৃপ্তির উপাদান আবিষ্কার করেছিলেন । পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সে যুগের মানুষ হলেও নিয়মিত ভাবে দিনলিপি লেখায় অভ্যস্ত ছিলেন । এ অভ্যাস তারাশঙ্করের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল । তারাশঙ্কর তাঁর পিতৃদেব প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত রূপ স্মৃতিচারণ করেছেন -

"মানুষ সংসারের যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি মর্মান্তিক পরাজয়ের ক্ষোভ বহনের দুঃখকে স্বীকার করেই জীবনতত্ত্বের অনুসন্ধানের প্রবৃত্তির এবং দৃষ্টি আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন । তিনি মারা যান অল্পবয়সে । আমার বয়স তখন আট বৎসর । কিন্তু তাঁর স্মৃতি আমার মনের উপর গভীর রেখাপাত করে গিয়েছে । ...তাঁর ডায়েরী খানির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় আমার নাম আছে । আমাকে সম্বোধন করে কিছু না কিছু লিখে গিয়েছেন । চোদ্দ পনর বৎসর বয়স থেকে ঐ ডায়েরী খানি পড়ে আসছি । আমাদের দৃষ্টি দিয়ে সেকালকে বুঝবার পক্ষে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে বাবার ঐ ডায়েরী । এই ডায়েরী আরও একটি পরিচয় বহন করে রয়েছে । সেটা হল, সেকালের ভারতবর্ষের মানুষের উপর ইউরোপের সভ্যতার প্রভাব পড়ার পরিচয় ।[১]

উন্নতমানের রুচিবোধ, শালীনতা, আভিজাত্য চেতনা, গভীর সংযম ও ত্যাগ স্বীকারের মনোভাব ইত্যাদি দুর্লভ গুণ তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর মাতা প্রভাবতী দেবীর কাছ থেকে । একটি বৃহৎ সংসারে কর্তৃত্ব করার মত যাবতীয় গুণই তাঁর ছিল এবং গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই তিনি বিরাট এক সংসারের গুরুভার তিনি নিজের ওপর তুলে নিয়েছিলেন । প্রভাবতী দেবীর কল্যাণ হস্তের স্পর্শে পারিবারিক জীবন সর্বাংশে শ্রী ও সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়েছিল অল্পদিনেই । তাঁর কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন -

"আমার জীবনে মা আমার সত্যসত্যই ধরিত্রী, তাঁর মনোভূমিতেই আমার জীবনের মূল নিহিত আছে, শুধু সেখান থেকে রসই গ্রহণ করেনি, তাঁকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে । ওই ভূমিই আমাকে রস দিয়ে বাঁচিয়ে প্রেরণা দিয়ে বলেছে, - আকাশ-লোকে বেড়ে চল, সূর্য আরাধনায় যাত্রা কর । তুলে ধর তোমার জীবন পুষ্প দিয়ে সূর্যার্ঘ্য । পৃথিবীর সম্পদকে তিনি তুচ্ছ বলেন না, লক্ষ্মীকেই তিনি অভিজ্ঞা

বলে থাকেন পূজাও দেন, প্রণাম ও করেন, কিন্তু তাঁর ইষ্টদেবতা হলেন বৈরাগ্যের দেবতা শিব।" ২

তারাশঙ্কর যথার্থই একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। দেশপ্রেমের এই প্রেরণা তিনি লাভ করেছিলেন পিতা ও মাতা এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী থেকে। শৈশবে তাঁর স্বদেশ ভাবনায় উন্মেষ হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে। লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করলেও বহু পূর্ব থেকেই আরও অনেক কুকীর্তির অনুষ্ঠান তাঁর দ্বারা হয়ে আসছিল। ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের সরকারী প্রস্তাব প্রকাশিত হয়েছিল। ক্যালকাটা গেজেটে ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর এই প্রস্তাব সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এর আগে ১৯০১ খ্রীঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দেওয়ার সময় লর্ড কার্জন ভারতীয় চরিত্র সম্বন্ধে একটি আপত্তিজনক মন্তব্য প্রকাশ করলে তৎকালীন বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের মনে যুগপৎ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। ১৯০৩ সালের জানুয়ারী মাসে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে লর্ড কার্জন দিল্লীতে এক দরবারের আয়োজন করেছিলেন। এর ফলে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অসন্তোষকে তীব্র ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধটির নাম 'অভ্যুক্তি'। ১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথ 'অকথা ও কুকথা' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করে ৭ই আগষ্ট তারিখে বিদেশী দ্রব্য বর্জন বিষয়ক আলোচনা সভায় পরবর্তী এক সভায় তা পাঠ করেন। এর ফলে সারা দেশে বিশেষ সাড়া পড়ে যায়। এ প্রসঙ্গে একজন গবেষক লিখেছেন —

"বঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবে যখন সারা দেশ এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য অনুভব করছে সেই উত্তেজনাময় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের স্থির মস্তিষ্ক প্রসূত কর্ম-নির্দেশ দেশবাসীর কাছে এসে পৌঁছতে দেরী হ'ল না।"

— সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।

(স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য) প্রথম প্রকাশ। পৃঃ ৪৯।

পবিত্র রাখী বন্ধনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জাতিকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন। এই উৎসবের স্মৃতি তারাশঙ্করের মনে ছিল অম্লান উজ্জ্বল হয়ে। তাঁর পিতা সেদিনের অভিজ্ঞতাকে দিনলিপির মধ্যে এইভাবে ধরে রেখেছিলেন —

"বেঙ্গল পার্টিশন হইয়াছিল। হিন্দু মুসলমান সকল জাতিই মনে মনে দুঃখ পাইয়াছে। বঙ্গদেশের এই দুঃখে বঙ্গবাসীগণ আজ নুতন করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। পরাধীনতায় দুঃখ অনুভব করিতেছেন। এই উপলক্ষে কলিকাতায় কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞাপন দ্বারা বঙ্গবাসীকে পরস্পরের হস্তে হরিদ্রাবর্ণের রাখী বাঁধিতে বলিয়াছেন। সকল বঙ্গবাসীই তাহা পালন করিবে। ইহা দ্বারাই আমরা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইব।"

— আমার কালের কথা (পৃঃ ৩৮)

তারাশঙ্করের পিতার মৃত্যু হয় ১৯০৬ সালে। অবশ্য, 'শতরূপা' সম্পাদক শ্রী নির্মল কুমার খাঁ মহাশয় হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সময় ১৯০৫ সাল বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমাদের হিসাব অনুসারে এই সময় হয় ১৯০৬ সাল। প্রমাণগুলো সূত্রাকারে উল্লেখ করা গেল :—

(১) 'আমার কালের কথা' নামক গ্রন্থে তারাশঙ্কর ১৯০৫ সালের রাখীবন্ধন উৎসবের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাঁর জীবনে এর প্রভাবের কথাও বলেছেন। কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে পিতার মৃত্যুর মত শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ করেননি। তাতে মনে হয়, এই বছরে উক্ত ঘটনা ঘটে নি।

(২) তারাশঙ্কর যখন তাঁর জীবনের প্রথম কবিতা 'পাখির ছানা মরে গিয়েছে' ইত্যাদি লেখেন তখন তাঁর বয়স আট বৎসর এবং তাঁর পিতা ঐ সময় গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী। এই দুটি ঘটনার কাল ১৯০৬। একই সময়ে রচিত কবিতা 'শারদীয়া পূজা যত নিকটে আইল' তার পিতা রোগশয্যায় পড়ে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। অতএব এই সময় অবশ্যই ১৯০৬।

(৩) তারাশঙ্করের আট বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যুর বিষয় 'আমার কালের কথা' গ্রন্থের ২০০ পৃষ্ঠায় এইভাবে উল্লেখ করা হয়েছে —" আট বছরেই আমার বাবা মারা গেলেন।" তার জন্মসাল ১৮৯৮ হলে পিতার মৃত্যুর বছর হয় ১৯০৬।

(৪) হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু যে ১৯০৬ সালেই হয়েছিল, তার একটি সুনিশ্চিত প্রমাণ অধুনালুপ্ত 'কৈশোর স্মৃতি' (তারাশঙ্কর রচিত) গ্রন্থের ৭০ পৃষ্ঠায় পাওয়া

পায় —"আমার কাল গণনায় যুগসন্ধিক্ষণ ১৯০৫ সালের ৩০শে আশ্বিন। তিনি (পিতা) সেই বৎসরেরই পরবর্তী ৯ই আশ্বিন মহাপ্রয়াণ করেছিলেন।"

(৫) "শৈশবেই (১৩১৩ আশ্বিন মাসে নবমী পূজার দিন) তাঁহার (তারাশঙ্করের) পিতৃবিয়োগ হয়।"[৩]

পিতার মৃত্যুর পর সংসারের রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর পিসীমা নিজের ওপর তুলে নিয়েছিলেন। দৈব দুর্বিপাকে তিনি তাঁর স্বামী ও দুই পুত্রকে হারিয়ে যথার্থই সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন, তথাপি, জীবনযুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন নি। তাঁর ছিল অফুরন্ত জীবনীশক্তি ও তীক্ষ্ণ বাস্তবদৃষ্টি। তিনি ছিলেন তেজস্বিনী ও দৃপ্তভাষিণী। গভীর জীবননিষ্ঠা ও সংগ্রামশীলতা ছিল পিসীমার প্রধান চরিত্র বৈশিষ্ট্য। তারাশঙ্কর পিসীমার প্রভাব সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন —

"আমার জীবনে যাঁদের প্রভাব রক্তে, মাংসে, মেদে মজ্জায় স্নায়ুতে মননে আত্মগত হয়ে আছে তাঁদের মধ্যে প্রথম তিন জনের তিনি একজন, বাবা, মা, পিসীমা।....তাঁর চরিত্রের ছায়া ধাত্রী দেবতায় পিসীমার ওপর পড়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই।"

১৯০৬ সালে তারাশঙ্করের বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাঁর রচিত একটি কবিতা কলকাতার 'ক্যালিডোনিয়ান প্রেস' থেকে মুদ্রিত হয়ে গ্রামস্থ জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হয়। এর প্রথম দুটি পংক্তি ছিল নিম্নলিখিতরূপ :—

"শারদীয়া পূজা যত নিকটে আইল।
তত সব লোকের আনন্দ বাড়িল।"

॥ কৈশোর জীবন ॥

তারাশঙ্করের কৈশোর নানা কারণেই উল্লেখযোগ্য। তাঁর সমাজ মানসের ভিত্তি গঠিত হয়েছিল এই পর্যায়েই। কিছু সংখ্যক বিরল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিক্ষকের সংস্পর্শে এসেছিলেন শিক্ষা জীবনের এই দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং তাঁর চরিত্র গঠনে তাঁদের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। এই সময় বৃহত্তর সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের জীবন সমস্যার সঙ্গে তিনি উপযুক্ত ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। কৈশোরের সেবা ও ত্যাগের মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল এই সব জীবনকে কেন্দ্র করেই। জীবনের যে উন্নততর আদর্শ তিনি

মনীষী ও মহামানবদের জীবন ইতিহাস থেকে লাভ করেছিলেন তার প্রয়োগ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়, প্রধানত এই কালেই। ১৯১২ সাল থেকে আরম্ভ করে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত নানাভাবে তিনি সমাজের সেবা করার মনোভাব নিয়ে কাজ করেছিলেন এবং নিজের পারিবারিক জীবনের ক্ষুদ্র সীমাকে প্রসারিত করেছিলেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সেই 'সমাজ সেবক সমিতি' নামে এক সংগঠন গড়ে ওঠে প্রধানত কিশোর তারাশঙ্করের নেতৃত্বে এবং পরিচালনায় তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর চোখে ছিল তখন স্বামী বিবেকানন্দের সমাজসেবা এবং শহীদ ক্ষুদিরামের আত্মোৎসর্গের উজ্জ্বল স্বপ্ন। একই সঙ্গে তিনি আশা পোষণ করতেন একজন বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ হিসাবে তিনি লোক সমাজে পরিচিত হবেন। সামনে ছিল তাঁর মোহনবাগান ক্লাবের অভ্যুন্নত ক্রীড়া নৈপুণ্য। কিন্তু মানব জীবনের অনেক ব্যর্থ আশার মতই এটিও কখনও ফলবতী হয় নি। তারাশঙ্কর তখন বিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সময় তিনি গ্রামের ফুটবল ক্লাব 'দি ফ্লুরা অ্যাথলেটিক ক্লাব'এর সদস্য ও পরে নেতা নির্বাচিত হন। ফুটবল খে কে কেন্দ্র করে তাঁর জীবনে কিছু বেদনাদায়ক ঘটনাও ঘটে। পরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় তিনি খেলায় কয়েকবার অংশগ্রহণ করলেও অধিকাংশ সময় খেলা দেখতেই ভালবাসতেন।

লাভপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় থেকে তারাশঙ্কর ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় পরীক্ষায় বসেন এবং প্রথম বিভাগে পাশ করেন। পর বৎসর তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন এবং পরে আশুতোষ কলেজের ছাত্র হিসাবে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। প্রধানত শারীরিক অসুস্থতা ও রাজনৈতিক কারণে তাঁর কলেজ জীবন ধারা ব্যাহত হয় এবং তিনি স্বগ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হন। এই সঙ্গে তাঁর সমগ্র জীবনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক জ্ঞানার্জনের সমাপ্তি ঘটে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যে প্রভূত বিমল আনন্দ লাভ করেন তার অনুরূপ কিছু তিনি বাকি জীবনের পরবর্তী অংশে কোন সময়েই লাভ করেন নি। এ তথ্য জানা যায় তাঁর নিজের বিবৃতি থেকেই। আনন্দে অধীর কিশোর তারাশঙ্কর সেকালের প্রথার প্রতি মর্যাদা দেখিয়ে সারাদিন ধরে গ্রামের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিগণকে প্রণাম জানিয়েছিলেন। সেদিন আশীর্বাদ প্রাচুর্য্যে সমৃদ্ধ হয়েছিল তাঁর জীবন।

লাভপুর বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি স্বাভাবিক নিয়মেই একাধিক শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। এই সব শিক্ষকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রধান শিক্ষক ছিলেন শশিভূষণ নিয়োগী মহাশয়। তাঁর বিদেশী শাসকবর্গের প্রতি বিশেষ সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব সমগ্র ছাত্রমহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ছাত্রসমাজের একাংশের গভীর স্বাদেশিকতা প্রধান শিক্ষকের রোষ ও ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। তারাশঙ্করও তিরস্কৃত হয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অঙ্কের শিক্ষক কালিবাবু। অপর শিক্ষকদ্বয় সতীশচন্দ্র মিশ্র (সত্যেন পণ্ডিত) এবং হরিচরণ রায় প্রভৃতির কথা তিনি সারাজীবন মনে রেখেছিলেন। ইংরেজীতে অসাধারণ জ্ঞানের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। গ্রামনিবাসী শিক্ষক হরিচরণ সরকারের কথাও তিনি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। ইনি ছিলেন ক্রীড়ানিপুণ। ভোজন রসিক এবং বিদেশী নানা জিনিসের প্রতি তীব্র আসক্তি সম্পন্ন। শিক্ষক গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁর প্রভাব তাঁর জীবনে ছিল সর্বাধিক তিনি হলেন নীলরতন বাবু। আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা'য় ইনি রামরতন বাবু নামে চিত্রিত হয়েছেন। ইনি ছিলেন তারাশঙ্করের গৃহশিক্ষক তাঁর সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় তিনি বলেছেন "এক মুখ দাড়িগোঁফ, বিশালকায় পুরুষ। সদানন্দ মানুষ, দেবতার মত চরিত্র - বহু শতের মধ্যে এমন মানুষ মেলে। নির্লোভ, নির্ভীক বিচিত্র। তেমনি কোমল, মধুর। লোকে বলত পাগল।" বিদ্যালয়ে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে তারাশঙ্করের প্রতি প্রধান শিক্ষক মহাশয় রুষ্ট হলে নীলরতন বাবুই তাঁর প্রিয় ছাত্রকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। এই শিক্ষকই তাঁকে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষিত করেছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা 'দেবাসুর সংগ্রামের এই তো সময় কিশোর তারাশঙ্করের প্রাণে নতুন এই উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

স্বভাবে তারাশঙ্কর অনেকটা আত্মমুখী হওয়ায় তাঁর বন্ধুর সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। পাঠ জীবনের একেবারে সূচনায় তাঁর বন্ধু ছিলেন গুরুদাস ও শিবকৃষ্ণ। পরে তাঁর সঙ্গী হলেন ক্ষুদিরাম সাহা, পঞ্চানন সাহা, ঠাকুরদাস পাল ও কৃষ্ণ পাল। পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁর উল্লেখযোগ্য সহপাঠী ছিলেন বিভূতি মিশ্র ও গৌরীবিলাস। এই বিভূতি মিশ্রের সঙ্গে অবসর সময়ে তাঁর কবিতা রচনার প্রতিযোগিতা হ'ত। বিভূতি মুখে মুখে কবিতা রচনা করায় নিপুণতা অর্জন করেন। অনেক পরে প্রৌঢ় অবস্থায় তাঁর সঙ্গে তারাশঙ্করের একবার দেখা হয়। সঙ্গীদের কথা বলতে গিয়ে তিনি -

রাধাশ্যাম মুখোপাধ্যায় ও সতীশ মণ্ডলের কথাও বলেছেন। কৈশোরে তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ছিলেন সতীশ মণ্ডল, বৈদ্যনাথ ও শিবপদ। 'কবি' উপন্যাসে শিবপদই 'বিপ্রপদ' নামক চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠের সময় তিনি গ্রামসুলভ শান্ত ভাবটি বর্জন করতে সক্ষম হননি। ফলে শহরের আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট ছাত্রগণের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়নি। কেবলমাত্র সাহিত্যচর্চা ও স্বাদেশিকতার সূত্রেই তিনি সুশীল, অনাথ ও আশু দাসের সঙ্গে একটু বেশী মাত্রায় পরিচিত হন।

॥ বিবাহ ও পারিবারিক জীবন
এবং প্রথম পর্যায়ের সাহিত্য সাধনা ॥

লাভপুরের প্রসিদ্ধ ধনী যাদবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী উমাশশী দেবীর সঙ্গে তারাশঙ্করের বিবাহ হয় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বয়স তখন ১৬ বৎসর। এই বিবাহের এক মাস পরেই তাঁকে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি সিউড়ীতে এসেছিলেন। তারাশঙ্করের বিবাহ ও প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার বৎসর যে ১৯১৪ তার সমর্থনে আমি দুটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করছি —

(১) "তখন পিসীমার মনেও ছোঁয়াচ লেগেছে। ষোল বৎসরের ছেলের সঙ্গে দশ বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে পরিণত বয়সে পুতুল খেলার নেশা ধরেছে মনে। বললেন – কুষ্ঠী দেখান হোক।" [8]

(২) "হঠাৎ আমার বোনের বিয়ের টানে আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে এবং বিয়ের প্রায় মাস খানেকের মধ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি। এই দুটোই ষোল বছরের একটি কিশোরকে বিশ বাইশ বছরের মর্যাদায় এবং মনোভাবে ভাবান্বিত করতে যথেষ্ট।" [৫]

সাবুজ জানপীঠ পুরিকার (১৯৬৬) ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্করের জীবন তথ্য পরিবেশন করতে গিয়ে লিখেছেন – "Immediately after his Matriculation he was married." তারাশঙ্করের নিজের তথ্যকে অধিকতর গুরুত্ব দিলে ঐ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতটির গ্রহণযোগ্যতা বজায় থাকে না। তাঁর জন্মসাল নিয়ে যখন কোন মতপার্থক্য নেই, তখন পরবর্তী হিসাব অনুসারে

বিবাহ ও পরীক্ষার বৎসর হিসাবে ১৯১৪ সালটিকে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। তারাশঙ্কর ১৯১৬ সালে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। তিনি এ বিষয়ে লিখেছেন -

"১৯১৬ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলাম।" [৬]

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এটিকে এক অসম বিবাহ বলা যায়। কারণ তারাশঙ্কর ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান এবং উমাশশী দেবী এসেছিলেন এমন এক বাড়ী থেকে, যেখানে আর্থিক অবস্থা ছিল ক্রমস্ফীত। এই বৃহৎ ব্যবধানের প্রাচীর ধূলিসাৎ করা সহজসাধ্য ছিল না। তাঁর আত্মীয়পক্ষ তারাশঙ্করকে আপন আর্থিক সমাজে গ্রহণ করে বৈষয়িক সমৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে পথ তারাশঙ্করের মনঃপূত না হওয়ায় অল্পদিন পরেই তা ত্যাগ করে সুনিষ্ঠ ও সুনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। উমাশশী দেবীর বয়সের দিক থেকে এটি ছিল বাল্যবিবাহ। তাই যৌবনের স্বাভাবিক বর্ণরঞ্জন ও ভাববিলাস এই জীবন থেকে প্রত্যাশিত ছিল না - সামান্য যেটুকু ছিল, তা হ'ল কিশোর-জীবনের চপলতা। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেছেন - "সত্য বলতে কি বধূর জন্য বিরহ অনুভবের কোন লক্ষণই আমার মধ্যে আমি অনুভব করিনি।" এই উক্তি থেকে তাঁর বিবাহিত জীবনের রোমান্স বিষয়ে যথার্থ সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯১৬ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় থেকেই তাঁর ওপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে। অল্প পরে তিনি যখন আশুতোষ কলেজের ছাত্র, তখন রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অজুহাতে পুলিশ বিভাগের চাপে তাঁকে কলেজের আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা ছাড়তে হয় এবং এই সময় তাঁর শরীরও বিশেষ ভাল না থাকায় তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সব কারণে তাঁর পারিবারিক জীবনও স্বাভাবিক হতে পারে নি। পরে ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের দিনগুলোতে তিনি আরও অধিক পরিমাণে কংগ্রেস পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। মধ্যবর্তী পর্বে আর্থিক উন্নতি সাধনের দুরাশায় এবং আত্মীয়গণের অতি আগ্রহে তিনি কিছুকাল পাটনায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই কাজ তাঁর চরিত্রের অনুরূপ হওয়ায় মত পরিবর্তিত হয় এবং তিনি পরিচিত সহজ জীবন যাত্রার জগতে ফিরে আসেন। ১৯২৪ - ২৫ সালের দিনগুলোতে আমরা তাঁকে বীরভূমের মহামারী বিধ্বস্ত গ্রামে সেবার কাজে ব্রতী দেখতে

পাই ।'পথের ডাক' নাটকে এই সময়ের কিছু ছবি আছে । তাছাড়া 'ধাত্রী দেবতা'র শিবনাথের জীবনে এই অভিজ্ঞতার রূপায়ণ চিত্রিত হয়েছে । ১৯২৭ – ২৯ সালে তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রামের উন্নতিমূলক নানা কাজে আত্মনিয়োগ – করেন । প্রধানতঃ ১৯২০ থেকে এই এই সময় পর্যন্ত তারাশঙ্কর নানা শ্রেণীর সেবামূলক কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং গ্রামীন সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত হয়ে পড়েন । তাঁর পরবর্তী কালের সাহিত্য সাধনার মূল উপাদান এই সময়ের অভিজ্ঞতা থেকেই গৃহীত । ১৯৩০ সালে তারাশঙ্করের রাজনৈতিক জীবনে সঙ্কট দেখা দেয় । তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং তাঁকে বন্দী হিসাবে সিউড়ীর জেলে পাঠান হয় । সেখানে তিনি মোট চারমাস সময় অতিবাহিত করেন । এই অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তিনি 'পাষাণপুরী' রচনা করেন । এটিই প্রথম বাংলা কারা কথা সাহিত্য 'এবং পূর্ববর্তী রচনা ' চৈতালী ঘূর্ণি'তে তিনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাকে ব্যক্ত করেন এবং শোষিত শ্রেণী যে বিপ্লব গর্ভ সেই সত্যকেই প্রকাশ করতে চান ।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে জন্মগ্রহণ করেন তারাশঙ্করের জ্যেষ্ঠ পুত্র সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । কনিষ্ঠ পুত্র সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯২২ সালে । জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গা দেবীর জন্ম হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এবং বুলুর জন্ম হয় ১৯২৬ সালে । ১৯৩২ সালে কলকাতায় বুলুর অকালমৃত্যু তারাশঙ্করের হৃদয়ে এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে । তাঁর সাহিত্য জীবন ও ধর্মীয় মানসিকতায় এই ঘটনার ছায়া পড়ে । এই সব ঘটনার অনেক আগে থেকেই তিনি প্রয়োজন অনুসারে লাভপুর থেকে কলকাতায় যাতায়াত করতে থাকেন । ১৯৩১ সাল থেকে তিনি এককভাবে এবং কয়েক বৎসর পরে সপরিবারে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন । আলোচ্য কালের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল চরম অর্থাভাব, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং সার্থকতা ও ব্যর্থতার মধ্যে দোদুল্যমানতা । শেষ পর্যন্ত তিনি সংশয় থেকে প্রত্যয়ের দৃঢ়ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ।

আট বৎসর বয়স থেকেই তিনি প্রাথমিক ভাবে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন । কৈশোরের বিদ্যালয় জীবনে যে ধারা অব্যাহত থাকে এবং পরে নাট্য রচনা ও কবিতার অনুশীলনে তিনি আন্তরিকভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন । ১৯২৫ সালে বীরভূমে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে তিনি তাতে অংশ গ্রহণ করেন । অনুষ্ঠান শেষে লাভপুর প্রত্যাবর্তনের

পর দুজন প্রতিনিধিকে নিয়ে তিনি চণ্ডীদাসের স্মৃতি বিজড়িত নানুর ভ্রমণ করেন ।এই অনুভবকে কেন্দ্র করে তিনি 'নান্নুর পথে' নামে একটি কবিতা রচনা করেন । কবিতাটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আষাঢ় ১৩৩৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । তারাশঙ্করের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'ত্রিপত্র' কাব্য - প্রকাশ কাল ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ । এটি উৎসর্গ করেন নির্মলশিব - বন্দ্যোপাধ্যায়কে । গ্রন্থটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য । এই সময়ে রচিত তাঁর অপ্রকাশিত সাহিত্য কীর্তি মারাঠা তর্পণ' নাটক । নাটকটির মূল উপাদান উৎস Grant Duff রচিত 'মারাঠাগণের ইতিহাস' (তিন খণ্ড) । লাভপুরের উজ্জ্বল নাট্যসংস্কৃতি তাঁর সাহিত্যিক মনে নাট্যকার রূপে আত্মপ্রকাশে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল । স্থানীয় রঙ্গমঞ্চে এই নাটক সগৌরবে অভিনীত ও হয়েছিল কলকাতায় নাট্যমঞ্চে নাটকটি অভিনীত হ'ক এই ইচ্ছায় বশবর্তী হয়ে তিনি আত্মীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন । কিন্তু তাঁর এই আশা শেষ পর্য্যন্ত ফলবতী হয় নি । এবং নাটকটির মূল পাণ্ডুলিপি অগ্নিতে অর্পন করেই তাঁর অন্তরের তীব্র ক্ষোভকে প্রশমিত করেছিলেন । এই ঘটনার অনেক পরে তিনি পুনরায় নাটক রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন । অবশ্য নাট্যকার হিসাবে পরে তিনি যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী হন এবং তাঁর নাটকসমূহ একের পর এক কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় । লাভপুরে বসবাসের সময় তিনি অনেকবার মঞ্চাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । তারাশঙ্কর প্রথম জীবনে যে সব নাটকে অভিনয় করেছিলেন , দিলীপ দাশগুপ্ত তাঁর 'সৌখীন নাট্যশিল্পী তারাশঙ্কর' শীর্ষক রচনায় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন ,সেটি এখানে উদ্ধৃত হ'ল ঃ —

॥ নারী চরিত্র ॥

চরিত্র		নাটক
বিনোদিনী	-	বঙ্গলক্ষ্মী
মরিয়ম	-	চাঁদবিবি
জ্ঞানদা	-	প্রফুল্ল
সীতা	-	সীতা
কল্যাণী	-	প্রতাপাদিত্য
মেজবৌ	-	গৃহলক্ষ্মী

।। পুরুষ চরিত্র ।।

চরিত্র		নাটক
শকুনি	–	কর্ণার্জুন
চন্দ্র এবং বিনোদ	–	শেষরক্ষা
শ্রীশ	–	চিরকুমার সভা
যজ্ঞেশ্বর	–	বঙ্গনারী
নসীরাম	–	মারাঠা তর্পণ
কেদার	–	বৈকুণ্ঠের খাতা
ভৃত্য	–	বশীকরণ

আমাদের দেশের মত পুরুষ কর্তৃক নারী চরিত্রে অভিনয়ের প্রথা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডে ছিল। সেক্সপীয়রের সময়ে ডিক রবিনসন নারী ভূমিকায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করতেন। এই তথ্য পরিবেশণ করেছেন বেন জনসন।

।। কঠোর সাহিত্য সাধনার কাল ।।
(১৯২৮ – ১৯৪০)

নির্মল শিববাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'পূর্ণিমা' নামে মাসিকপত্র প্রকাশিত হলে তারাশঙ্কর তার সহ সম্পাদক নিযুক্ত হন এই পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'স্রোতের কুটো' ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস 'দীনার দান' তাঁর 'মারাঠা তর্পণ' নাটকের সমকালে রচিত হয়। উপন্যাসটিতে তিনি শরৎচন্দ্রকে ব্যর্থভাবে অনুসরণ করেন বলে জানা যায়। উপন্যাসটি প্রাথমিকভাবে শিশির বসু সম্পাদিত 'শিশির' নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি এবং এবিষয়ে ঔপন্যাসিকের কোন আগ্রহ না থাকায় বইটির বিষয় তিনি প্রায় বিস্মৃত হন। উপন্যাসটি সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস লিখেছেন –

> "দীনার দান' তখনও পর্য্যন্ত দীন তারাশঙ্করের দান বলিয়া যথাযোগ্য মর্যাদায় গৃহীত হয় না। কালের কুটিল প্রবাহে তাহাও হারাইয়া যায়।"[৭]

'রসকলি' গল্পটি রচনার পর তৎকালীন শ্রেষ্ঠ স্থানীয় মাসিকপত্র 'প্রবাসী' তে পাঠান। কিন্তু দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও গল্পটি সেখানে প্রকাশিত হয়নি। পরে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

'কল্লোল' পত্রিকার পক্ষ থেকে গল্পটি নির্বাচন করেন এবং এই উদীয়মান সাহিত্যিককে উৎসাহদান করেন। প্রসঙ্গটি স্মরণ করে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন —"রসকলি প্রকাশ করে কল্লোল এবং কল্লোলের পক্ষে মুখ্যত আমি হয়তো তারাশঙ্করের জন্য বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশের বন্ধ দরজাটি খুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু অচিরেই সেখানে রাজসিংহাসন দখল করতে পেরেছিলেন তারাশঙ্কর সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায়।" ১৯২৮ সালে তারাশঙ্কর কল্লোল পত্রিকার গ্রাহক হন। এই সময় একদিন তিনি এই পত্রিকার কলকাতা অফিসে উপস্থিত হলে প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি সাহিত্যিকগণের সঙ্গে পরিচিত হন। পরে তাঁর গল্পসমূহ 'উপাসনা' 'উত্তরা' এবং 'কালিকলম' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। কল্লোল পত্রিকার সংস্পর্শে তাঁর সাহিত্যিক আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত হলেও তিনি এর ভাবধারার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হন নি। অচিন্ত্যকুমার এবং বুদ্ধদেব বসু প্রবর্তিত বুদ্ধিবাদ ও আঙ্গিক সর্বস্বতা এবং নব রোমান্টিকতা তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে গ্রহণ করেন নি। অল্পকালের মধ্যে তিনি কালিকলম পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসু, আর্য্য পাবলিশিং হাউস এর শশাঙ্ক চৌধুরী এবং 'বারবেলার আসর' এবং কিরণকুমার রায়, সরোজ রায় চৌধুরী, সুবোধ রায়, ক্ষীতু পাল ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে ওঠেন। এঁদের মধ্যে কিরণ রায় ছিলেন তাঁর ঘনিষ্টতম বন্ধু। পরে 'শনিবারের চিঠি'র সংস্পর্শে আসার পর, সজনীকান্ত দাশ তাঁর পরম হিতৈষী হয়ে ওঠেন। এই সম্পর্কের আন্তরিকতা ও পবিত্রতা সজনীকান্তের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল।

তারাশঙ্কর বলেছেন —" হারানো সুর' আমার দ্বিতীয় গল্প। ১৩৩৫ এর বৈশাখের কল্লোলে বের হ'ল।" কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য এই যে, 'হারানোসুর' তাঁর দ্বিতীয় গল্প নয়। কারণ এই সময়ের বহু পূর্বে ১৯২৬ সালে 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর লেখা 'শৈলবালার তাসের ঘর' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হয়। সে বিষয়ে 'হারানো সুর' তাঁর চতুর্থ গল্প। অবশ্য 'কল্লোলে' প্রকাশিত গল্পের মধ্যে এটি দ্বিতীয়। তাঁর তৃতীয় গল্প হল 'রসকলি'। এবং প্রথম গল্পের নাম 'স্রোতের কুটো'।

স্বদেশ সেবার জন্য বিদেশী শাসকের হাতে তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন ১৯৩০ সালে এবং বীরভূমের সিউড়ি জেলে বন্দীজীবন যাপন করেন। এই সময় তিনি আমাদের দেশের বন্দীশালার অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই অভিজ্ঞতায় এক দিকে ছিল সাধারণ অপরাধীদের জীবন এবং অপরদিকে ছিল রাজনৈতিক বন্দীগণের

দেশের কাজে উৎসর্গীকৃত একাগ্র সাধনায় জীবন ও জীবন দর্শন। তাঁর সাহিত্য মানসের মধ্যে এই স্বল্পকালীন জীবন যেন স্থায়ীভাবে ছাপ ফেলেছিল। পরবর্তীকালে বহুখ্যাত 'বিচারক' রচনাকালে যে মানবতার প্রশ্নটিকে বড় করে দেখে বিচার সুস্থতায় সত্যকে দেখতে চেয়েছিলেন তার মূল ছিল হয়ত এই জীবনের মধ্যেই। জেলে বসে তিনি 'চৈতালী ঘূর্ণি ও 'পাষাণপুরী'— এই দুটি উপন্যাস রচনা শুরু করেন। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই সময় থেকে সংকল্প গ্রহণ করেন অবিরাম সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে দেশ সেবায়।

১৯৩০ সালের পর তারাশঙ্কর স্বগ্রাম লাভপুর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বাস করতে শুরু করেন। প্রথমদিকে তিনি ভবানীপুরে গিরীন্দ্রনাথ মল্লিক রোডে জনৈক আত্মীয়ের গৃহে অবস্থান করতেন। ১৩৩৬ সালে তারাশঙ্কর রচিত 'সৈরিণী' নামক গল্পটি 'রাইকমল' নামে 'কল্লোল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্প তাঁর 'কলকলির' খ্যাতিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। এর পর তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' প্রকাশিত হয়। বইটি উৎসর্গ করা হয় সুভাষ চন্দ্র বসুকে। উপন্যাসটির মূল অবলম্বন ছিল 'শ্মশানের পথে' নামে একটি গল্প যেটি 'কালি কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পূর্বেই তিনি সুভাষ বসুর সঙ্গে পরিচয়ের সেই ভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং বোলপুরে যখন তিনি একটি প্রেস স্থাপন করে অনিবার্যভাবে এক রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে জড়িত হয়েপড়েন তখন নেতাজী তাঁকে ছাপাখানাটি লাভপুরে অপসারণের পরামর্শ দেন। ১৯৩২ সালে কলকাতায় থাকার সময়েই তাঁর কন্যা বুলুর মৃত্যু হয়। এই শোকাবহ ঘটনা তাঁর মনে এক চিরস্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি 'শ্মশান ঘাট' নামে এক গল্প রচনা করেন। ১৯৩৩ সালে তারাশঙ্করের জীবনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। শান্তিনিকেতনে পল্লী কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে তারাশঙ্কর সেখানে উপস্থিত হন এবং — রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। পরে আর একবার শান্তিনিকেতনে তারাশঙ্করের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

সাহিত্যিক তৎপরতা ও প্রতিষ্ঠা ব্যাকুলতা তারাশঙ্করের গ্রাম ত্যাগ ও কলকাতা বাসের একমাত্র কারণ নয়। তাঁর আত্মীয়গণের বিরোধিতাও সবিশেষ গণনাযোগ্য। যাই হ'ক ,কলকাতায় আসার পর তিনি সমস্ত শক্তি ও সময় সাহিত্য সেবায় নিয়োগ করেন। প্রতিকূল ও অনুকূল উভয়বিধ অবস্থারই সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। এই সময়ের

দিনগুলোতে তাঁকে কঠোরভাবে সংগ্রাম করতে হয়। ১৯৩৩ সালে শুরু হয় তাঁর মনোহরপুকুর রোডের জীবন। মাসিক পাঁচ টাকা ভাড়ায় টিন ছাওয়া একটি ঘর, খাওয়ায় ব্যবস্থা বাইরে মোট মাসিক খরচা ত্রিশ টাকা। সে সময় অবশ্য এই খরচ চালানও সহজসাধ্য ছিল না। তাছাড়া লেখক হিসাবে তখন তাঁর আয়ও যৎসামান্য। প্রায়ই টাকার অভাবে কষ্ট পেতে হ'ত। নিজের কাজ নিজেই করে নিতেন। সব মিলিয়ে এক পরিপূর্ণ স্বনির্ভরতার ছবি। তিনি এই সামান্য ঘরখানিতে এক বছর ছ'মাস সময় অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময়ের সাহিত্য ফসলের অধিকাংশই 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই পরিবেশিত হয়েছিল। প্রচণ্ড আর্থিক অসুবিধায় দিনগুলোতে পরিমল গোস্বামী যথাসাধ্য করেছিলেন। তিনি তখন 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক। অতিরিক্ত ধূমপান ও চাপানের অভ্যাস এই সময়েই গড়ে ওঠে – যা বর্জন করতে পরে তাঁকে অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। সাহায্যকারী ও সঙ্গী হিসাবে ছিল সেবক ষষ্ঠী দাস। তখনকার অনেক গল্পই রচিত হওয়ার পর প্রথম শ্রোতার আসনে বসত ষষ্ঠী দাস এবং শোনারপর তার মতামতও প্রকাশ করত।

এই সামান্য ঘরখানিতে তারাশঙ্করের এমন কতকগুলি ছোটগল্প রচিত হয়েছিল, সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব জগতে যেগুলি ইতিহাস সৃষ্টি করেছে এবং রবীন্দ্রনাথের মনেও সাড়া জাগিয়েছে। এই সব বিখ্যাত গল্প হ'ল 'জলসাঘর' 'রায়বাড়ি,' 'তারিণী মাঝি' 'আখড়াই এর দীঘি' প্রভৃতি। এখানে রচিত অপর গল্পগুলি হল 'শ্মশান বৈরাগ্য' 'ছলনাময়ী' 'মধু মাস্টার' 'মালের ফুল' 'ব্যাধি' 'রঙীন চশমা' 'প্রতীক্ষা' ইত্যাদি। আর একটি বিখ্যাত নাটকের বীজগল্প এখানে রচিত হয় – 'নুটু মোক্তারের সওয়াল'। এই গল্পেরই নাট্যরূপ 'দুই পুরুষ'। 'আগুন' উপন্যাসটিও এখানে রচিত হয়েছিল। তবে এর খসড়া প্রস্তুত হয় কিছু কাল পূর্বে বিহারের 'মগমা' নামক স্থানে। অভিজ্ঞতার মূলে ছিল একটি ফায়ার ব্রিকসের কারখানা। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৩৩ – ৩৪ এ রচিত গল্পগুলি প্রকাশিত হয় 'বঙ্গশ্রী' 'শনিবারের চিঠি' 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায়। ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত উপন্যাস মাত্র একখানি 'রাইকমল'। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল উমা দেবীকে। লেখক নিজের খরচে বইটি ছাপেন। প্রকাশিত হয় সজনী-কান্তের প্রকাশন সংস্থা 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' থেকে। ১৯৩৬ সালে দশটি ছোটগল্প নিয়ে প্রকাশিত হয় 'ছলনাময়ী'। তিনি 'জলসাঘর' ও 'ছলনাময়ী' উপহার স্বরূপ রবীন্দ্-

25 MAR 1981 73915

নাথের কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছ থেকে বিশিষ্ট প্রশংসাও লাভ করেছিলেন। 'রাইকমল' সম্পর্কে তারাশঙ্করের নিকট প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের চিঠিটি ছিল এই রকম —

> "আমার পরিচরবর্গ আমার আশে পাশে উপস্থিত না থাকায় তোমার বইদুখানি আমার হাতেই এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তাতে পরিতাপের কোন কারণ ঘটে নি। তোমার 'রাইকমল' আমার মনোহরণ করেছে।"
>
> — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

'রসকলি' ও 'রাইকমল' তাঁকে নির্দিষ্ট সাহিত্যিক মহলে বিখ্যাত করে তুললেও সমগ্র দেশের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তাঁকে বেশ কয়েক বছর ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। লিখে উপযুক্ত অর্থও তিনি পান নি। প্রথম দিকে একটি গল্পের দক্ষিণা ছিল মাত্র পাঁচ টাকা। 'দেশ' পত্রিকা তাঁকে সর্বপ্রথম 'প্রতিমা' গল্পটির জন্য পঁচিশ টাকা দিয়েছিলেন। এটি তখনকার দিনে সর্বোচ্চ দক্ষিণা। কারণ অন্যান্য পত্রিকা এই হার দশ টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।

তিরিশের দশকে তারাশঙ্করের রচনাধারায় পরিচয় নিলে দেখা যায় - এই পর্বে তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা নগণ্য। এই সময় মুখ্যত তিনি ছোটগল্প রচনা করেছিলেন। 'কল্লোল' ও 'কালি কলম' ব্যতীত অপর কোন বিখ্যাত পত্রিকায় তারাশঙ্করের গল্প প্রথম দিকে প্রকাশিত হয় নি। ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডাইনীর বাঁশি' এবং পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত ২ আর একটি গল্প অবশ্য এর ব্যতিক্রম। পরের দিকে এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৩৪০ সাল থেকে বিখ্যাত পত্রিকাগুলি তাঁর গল্প প্রকাশ করতে থাকে। এই যুগের একটি স্বল্প পরিচিত উপন্যাসের নাম 'প্রেম ও প্রয়োজন'। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'অভ্যুদয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন এটির নাম ছিল 'বেদের বেসাতি'। প্রথম সংস্করণের প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭১ এর ডিসেম্বর মাসে 'তুলি ও কলম' থেকে।

তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিকথায় 'মেলা ও 'ডাইনীর বাঁশি' গল্প দুটির প্রকাশকাল ১৩৩৮ সালের বৈশাখ বলে উল্লেখ করেছেন। এ তথ্য ভুল বলে মনে হয়। কারণ, তিনি যদি রবীন্দ্র মৈত্রের মৃত্যুর পর সনৎ কুমারের উপনয়ন উপলক্ষে দেশে গিয়ে থাকেন, তবে ঐ মৃত্যুর তারিখ (সজনীকান্ত দাস এর 'আত্মস্মৃতি' দ্রষ্টব্য) অনুসারে ঐ সময় ১৩৩৯ সালের শেষ'এর পর গল্পদুটি প্রকাশিত হলে প্রকাশকাল হবে ১৩৪০ সালের বৈশাখ (১৯৩৩)।

১৯৩৭ সালের পূর্ববর্তী সময়ে তারাশঙ্কর কিছুদিন বউবাজারের একটি মেসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এখানে থাকার সময় কলকাতায় একটি রঙ্গমঞ্চে 'চৈতালি ঘূর্ণি'র অভিনয় উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ত্রিশের দশকে কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তারাশঙ্করের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন তাঁর জীবনের আর একটি বড় ঘটনা। ১৩৩৪ সালের শেষের দিকে মোহিতলাল 'শনিবারের চিঠি'র নেতা হয়ে ওঠেন। অবশ্য তাঁর সঙ্গে তারাশঙ্করের প্রথম দেখা হয় 'বঙ্গশ্রী' অফিসে। 'শ্মশানঘাট' 'মেলা' 'ঘাসের ফুল' প্রভৃতি গল্প মোহিতলালের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তারাশঙ্কর লিখেছেন —

'তিনি (মোহিতলাল) আমার গুরুদের অন্যতম। আমার জীবন সাধনায় তাঁর কাছ থেকে অহরহ অভয়বাণী পেয়েছি, তন্ত্রাসিদ্ধ উত্তরসাধকের অভয়ের মত। তাঁর চরিত্র তাঁর সাধনায় শিক্ষা জীবন ও জগৎ রহস্যের উদঘাটন করে তাঁর লীলাপ্রত্যক্ষ করার বিচিত্র দৃষ্টি আমার উপর এমনই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তাঁকে একদা লিখেছিলাম —'আমি দীক্ষা গ্রহণের জন্য গুরু অনুসন্ধান করিতেছি। আপনি কি আমাকে দীক্ষা দিতে পারেন?"[৮]

১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে মোহিতলাল তারাশঙ্কর বিষয়ক একটি প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার সবটুকুই আজ সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তারাশঙ্কর জীবনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৩৫৪ সালের ৮ই শ্রাবণ সজনীকান্ত দাশ কর্তৃক একটি অভিনন্দন সভার আয়োজন হলে মোহিতলাল তাঁর আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন —

''বর্তমান কালের কথাশিল্পীগণের মধ্যে তুমিই যে অগ্রগণ্য ইহা আমার নিজস্ব বিশ্বাস। আমি আশা করি তুমি তোমার এই শক্তির দ্বারা বাংলা ও বাঙালীর আত্মাটিকে আরও গভীর এবং আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত কর। তোমার পঞ্চাশত্তম জন্মদিনে ইহাই আমার প্রাণের কামনা ও আশীর্বাদ।"[৯]

অবশ্য মোহিতলাল তাঁর উগ্র স্বমতপ্রিয়তার জন্য পরম স্নেহ ও প্রীতিভাজন সজনীকান্ত দাশ এবং তারাশঙ্করের সঙ্গে পরে এই সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। এই বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে সমালোচক আজহারউদ্দীন খান মন্তব্য করেছেন —

"যে শনিবারের চিঠিকে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন, যার সম্পাদককে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করতেন, বাঙালীর অবস্থায় মর্মাহত হয়ে সেই প্রিয়বন্ধুর সংস্রব ত্যাগ করলেন (ফালগুণ – ১৩৫১) । ....চিঠির গোষ্ঠীভুক্ত তারাশঙ্কর – বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তিনি কোন সম্পর্ক রাখেন নি । যে তারাশঙ্কর মোহিতলালের সাত্ত্বিক তান্ত্রিক সাধনা দেখে তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন ,সেই তারাশঙ্কর যখন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে হিন্দীকে সমর্থন করলেন,তখন মোহিতলাল তাঁকেও ত্যাগ করলেন ।" [১০]

কলকাতায় অবস্থানের তৃতীয় পর্যায়ে তারাশঙ্কর বউবাজারের মেসবাড়ী ত্যাগ করে চলে আসেন শান্তিভবন বোর্ডিং–এ । এটির অবস্থান হ্যারিসন রোড ও মীর্জাপুর সংলগ্ন । সময়টা ১৯৩৮ সাল । পূর্ববর্তী অবস্থায় তুলনায় এটি ছিল স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ এবং তিনি সেজন্য স্বস্তির সঙ্গেই একাগ্রচিত্ত হয়ে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পেরেছিলেন । এখানকার জীবন নানা কারণেই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তাঁর বিখ্যাত অনেক উপন্যাসই এখানে রচিত হয়েছিল । আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা' রচনার কাজ আরম্ভ ও শেষ হয় এখানেই এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালে । 'কালিন্দী' রচনাও আরম্ভ করেন । তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় এম এ পড়ার জন্য এই বাড়ীতে এসে ওঠেন । তারাশঙ্করের শান্তিভবনের জীবনেও স্নানাহারের অনিয়ম, লেখার অজস্রতা, প্রভুত চা ও ধূমপান ইত্যাদি অভ্যাস অপরিবর্তিত ছিল ।

শান্তিভবন বোর্ডিং এ অবস্থানকালে খ্যাতনামা সাহিত্য গবেষক দীনেশচন্দ্র সেন এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয় । তিনি ছিলেন প্রাচীন সৌজন্যবোধ ও স্নেহ মাধুর্যের মূর্ত বিগ্রহ । হিমাংশু রায় ছিলেন দীনেশ সেনের আত্মীয় এবং বম্বে টকীজের সঙ্গে জড়িত । ঐ সময় সেখানে একজন গল্প লেখকের প্রয়োজন হওয়ায় দীনেশ সেন তারাশঙ্করের নাম প্রস্তাব করেন এবং অবিলম্বে বোম্বাই এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন । এই কাজের পারিশ্রমিক ছিল অত্যন্ত লোভনীয় । তারাশঙ্কর বিষয়টি বিবেচনার জন্য কয়েকদিনের সময় প্রার্থনা করেন এবং অবশেষে সবিনয়ে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন । এই সুযোগ গ্রহণ করেন সাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় । সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে তিনি যেন তাঁর জীবনদেবতার নির্দেশই শিরোধার্য করেছিলেন । ঘটনাটির মধ্যে তারাশঙ্কর চরিত্রের সংকল্প দৃঢ়তা, ও প্রলোভন শূন্যতার সত্য প্রকাশ পেয়েছে । প্রসঙ্গটি

স্মরণ করে, তিনি বলেছেন –"ফিরে গেলাম মনের জোর। স্থির করে ফেললাম যাব না। এই পথের সাধনা ছেড়ে আমি যাব না। তাতে আমার যা ঘটে ঘটুক।" দীনেশ সেন তারাশঙ্কর মনের এই দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলেন এবং সানন্দে "তোমার জয় হোক" বলে অভিনন্দিত করলেন।

সম্ভবত ১৯৩৯ সালের শেষের দিকে তারাশঙ্কর শান্তিভবন ত্যাগ করে মোহন-বাগান রো-এর একটি বাড়ীতে উঠে আসেন। তখন একই বাড়ীতে থাকতেন বরেণ্য গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সজনীকান্তের বিশেষ অনুরোধে তারাশঙ্কর নতুন বাড়ীতে উঠে আসেন। শান্তি ভবনের জীবনে চা ও ধূমপানের আধিক্য তাঁর স্বাস্থ্য হানির কারণ হয়েছিল। প্রতিদিন চা পানের মাত্রা ৬০ কাপ অতিক্রম করেছিল। নতুন বাড়ীতে আসার পর তিনি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্যও উন্নতি হ'ল। একই বাড়ীতে সজনীকান্ত দাশ সস্ত্রীক বসবাস করতেন। তাঁর স্ত্রী সুধা দেবীর সস্নেহ পরিচর্যা তারাশঙ্করকে গুরুতর স্বাস্থ্যহানি এবং অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। এখানে থাকার সময় আর একজন উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন – ইনি হলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সাহিত্যিকের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এক গভীর বিদ্যাবত্তা তাঁর আকর্ষণের কারণ হয়েছিল।

১৯৪০ (৬ই বৈশাখ –১৩৪৭) সালে তারাশঙ্কর পুনরায় স্থান পরিবর্তন করেন এবং চলে আসেন বাগবাজারের ১১১ আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে। ইতঃপূর্বে তিনি প্রভূত সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করেছেন কিন্তু পরিবারস্থ লোকজনের প্রতি সন্তোষজনকরূপে কর্তব্য পালন করতে পারেন নি। তাছাড়া, আত্মীয় স্বজনের কঠোর সমালোচনা তখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি কারণ, বৈষয়িক প্রতিষ্ঠা তিনি তখন পর্যন্ত লাভ করেন নি। উমা দেবীর মনে এ বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। এই সব কারণে তিনি নতুন বাড়ীতে এসে মোটামুটি স্থিতিলাভ করতে চেয়েছিলেন।

॥ স্বর্ণযুগঃ পূর্ণ প্রতিভা বিকাশের কাল ॥
(১৯৪০ – ১৯৫২)

আনন্দ চ্যাটার্জী লেনের বাড়ীতে আসার পর তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা 'ডাইনী' গল্প। এটি ১৩৪৭ সালের আষাঢ় সংখ্যায় প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়।

'কালিন্দী' উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ সালের ভাদ্র মাসে । উৎসর্গ করা হয় সজনীকান্ত দাসকে । 'কবি' উপন্যাসের বীজ গল্পটি কার্তিক মাসের প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল । এই বাড়ীতে বসেই শিল্পী 'কবি' উপন্যাসের 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ ক্যানে' গানটি রচনা করেন । এটি রচনার সময় তিনি শিল্পী যামিনী রায় এর সকৌতূহল প্রেরণা লাভ করেন । তিনি তখন নিয়মিতভাবে যামিনী রায় এর সাহচর্য্য লাভ করতেন । 'কবি' উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশের পূর্বে পাটনায় 'প্রভাতী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় । একই সময়ে 'রাঙাদিদি' ও 'চোরের পুণ্য' গল্প দুটি ভারতবর্ষে, 'দিল্লী কা লাড্ডু' এবং 'একরাত্রি' শনিবারের চিঠিতে, 'বন্দিনী কমলা' শারদীয়া আনন্দবাজারে, 'চন্দ্র ডামাই এর জীবনকথা' দেশ' - এ এবং 'পিল্লুর' গল্পটি 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । বাগবাজারে বসবাসের সময় তাঁর পারিবারিক জীবন একেবারে বিঘ্নহীন ছিল না । 'কবি' রচনার কালে স্ত্রী উমা দেবী গুরুতর ভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন । তাঁর আরোগ্যলাভের অল্পকালের মধ্যে অকস্মাৎ কন্যার পীড়া গুরুতর আকার ধারণ করে । সাময়িকভাবে অর্থশূন্য তারাশঙ্কর অত্যন্ত বিচলিত ও অসহায় হয়ে পড়েন । তখন যিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে সমস্ত পরিবারটিকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি হলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু । সামান্য - পরিমাণ অর্থের জন্য তখনও তারাশঙ্করকে প্রকাশকদের দ্বারস্থ হতে হ'ত - অধিকাংশ সময়ে রূঢ় প্রত্যাখ্যান, কখনও বা সামান্য বিবেচনা ও দাক্ষিণ্য । কয়েক বৎসর পূর্বে 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের কপিরাইট মাত্র একশত টাকায় বিক্রয় করেছিলেন এবং 'ছলনাময়ী' গল্পগ্রন্থ প্রকাশের সময় কোন অর্থ তিনি গ্রহণ করেন নি । প্রকাশকগণের মধ্যে একমাত্র কাত্যায়নী বুক স্টলের গিরীন ঘোষ তাঁকে সর্বদা আনুকূল্য দেখাতেন । ১৯৪০ সালে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ভারতবর্ষ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের জন্য একটি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে এক চুক্তি হয় । স্থির হয় পারিশ্রমিক স্বরূপ তিনি বৎসরে দুইশত টাকা পাবেন । এই চুক্তির ফলে তারাশঙ্কর 'গণদেবতা' উপন্যাস রচনায় হাত দেন ।

তারাশঙ্কর জীবনের পরবর্তী অধ্যায় আরম্ভ হ'ল বরানগরে তাঁর নতুন কেনা বাড়ীতে । ১৩৪৭ সালের শেষের দিকে তিনি বাড়ীটি কিনেছিলেন - এর ঠিকানা ছিল ৩৬।৪।১ কাশীনাথ দত্ত রোড, বরানগর । কলকাতা । নতুন বাড়ীতে উঠে এলেন

১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহে। এতদিনে ভাড়া বাড়ীতে থাকার গ্লানি ও ক্ষোভ অপনোদিত হ'ল। উমা দেবীর উৎসাহ ও যত্নে এই বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। ১৯৪১ সালের সমস্ত অংশেই তারাশঙ্কর নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করার কাজে এতই ব্যস্ত থাকলেন যে, অন্য কোন বিষয়ে তিনি মনোনিবেশ করতে পারলেন না। এই সময়ে তিনি নাট্যভারতী ও নাট্য নিকেতনের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর 'কালিন্দী' নাটকটি নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয় কিন্তু নানা কারণে এই অভিনয় বিশেষ সার্থকতা লাভ করে নি এবং তাঁর আর্থিক লাভও হয়নি। 'কালিন্দী' নাটক পুস্তকাকারে ১৩৪৮ এর শ্রাবণ মাসে এবং 'তিনশূন্য' গল্পগ্রন্থ বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য কালে 'হরিপণ্ডিতের কাহিনী' 'সনাতন' 'প্রত্যাবর্তন', যাদুকরী প্রভৃতি গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪২ সালটি তারাশঙ্কর জীবনে সর্বাধিক সাহিত্যিক তাৎপর্য পূর্ণ। একই বৎসরের আষাঢ় মাসে 'দুই পুরুষ' নাটক, আশ্বিন মাসে 'গণদেবতা' উপন্যাস, ফাল্গুন মাসে 'পথের ডাক' নাটক এবং চৈত্র মাসে 'প্রতিধ্বনি' গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৪২ এর কলকাতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বৃহৎ পর্যায়ের জন্য ঘটনাবহুল ও উত্তেজনামুখর। তাছাড়া আলোচ্য সময়সীমার মধ্যেই তিনি 'অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স এণ্ড আর্টিস্টস এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে বৃত হয়েছিলেন। তথাপি জীবনের এই স্তরে তারাশঙ্কর নাট্যকার হিসাবে খ্যাতিলাভের জন্য একটু বেশী মাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৫ সালের 'মারাঠা তর্পণ' নাটকের ব্যর্থতার ক্ষোভ তাঁর মনে এতকাল সঞ্চিত ছিল। যে নাটকটিকে ভিত্তি করে তাঁর নাট্যকার খ্যাতির সমৃদ্ধি হয় সেটি হল 'দুই পুরুষ'। 'দুই পুরুষ' নাটক হিসাবে খুব উঁচু মানের না হলেও সমসাময়িক নাট্যজগতে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। নাটককে কেন্দ্র করেই তারাশঙ্কর অভিনয় জগতের দিকপাল ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ী, নৃপতি সেন প্রভৃতির সংস্পর্শে আসেন।

১৯৪২ সালে বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য তারাশঙ্করের কাছে আহ্বান আসে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এই অনুষ্ঠানে মূল সভাপতি ছিলেন মনীষী নলিন চন্দ্র গুপ্ত। তারাশঙ্কর এই সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়ে ছিলেন এবং পূর্বোক্ত দুই ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে অ্যান্টি ফ্যাসিস্ট রাইটার্স এ্যাণ্ড আর্টিস্টস এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হলে এর প্রথম

সভাপতি নির্বাচিত হন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বৎসরের সভাপতি ছিলেন অতুল গুপ্ত এবং তৃতীয় বৎসরের জন্য তারাশঙ্করকে বিশেষ অনুরোধ জানান হয়। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যেই তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে এটি ১৯৪৩ সালের শারদীয় আনন্দবাজারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে তারাশঙ্করের ওপর কমিউনিষ্ট চিন্তাধারা কিছুটা প্রভাব দেখা যায়। আলোচ্য কালে অর্থাৎ যখন তারাশঙ্কর এই সংস্থার সভাপতি, তখন তিনি গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রভৃতি - ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হন। পরে এই পরিচয় ক্রমে বেশ গভীর হয়ে ওঠে। কয়েক বৎসর পরে তিনি এই সংস্থার সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তারাশঙ্করের সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'মন্বন্তর' 'কবি' ও 'পঞ্চগ্রাম'। এগুলির মধ্যে 'কবি' রচনায় মূল প্রেরণা ভাবধর্ম ও ইতিহাস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু রাজনৈতিক সঙ্কটকালের ভারতবর্ষের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে 'মন্বন্তর' ও 'পঞ্চগ্রাম' এর মধ্যে। একদিকে সহর, অন্যদিকে গ্রাম - এই দুই পটভূমির জীবনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দিয়েই তারাশঙ্কর তৎকালীন জীবন চিত্রের সম্পূর্ণতা। ১৯৪৩ সালেই তারাশঙ্কর তাঁর দৃষ্টিকে সহরের জীবনের দিকে সাহিত্যিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিবদ্ধ করলেন। এই সময়, এক ভিন্নধর্মী রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্মপন্থার সঙ্গে সর্বপ্রথম তাঁর পরিচয় সাধিত হ'ল এবং তিনি তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসমতে তুলনা-মূলক দৃষ্টিতে যাচাই করার চেষ্টা করলেন। 'মন্বন্তর' উপন্যাসটিতে তিনি রচনামাধ্যম হিসাবে চলিত বাংলা ব্যবহার করলেন। এতদিন পর্যন্ত তাঁর অবলম্বন ছিল সাধু বাংলা। অতএব, বিষয়টি তাঁর মনোভঙ্গী পরিবর্তনের সূচক। এই মর্মে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকাও তিনি উপন্যাসটির প্রারম্ভে সন্নিবেশ করলেন।

১৯৪৬ সালের আনন্দবাজার পূজা সংখ্যায় 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' প্রকাশিত হয়। তখন কমিউনিষ্ট সমাজ যে প্রশংসা করেছিলেন, তারাশঙ্করের ভাষায় তা আকাশস্পর্শী। এবং তাঁর বাড়ীতে এসেও কয়েকজন এই অন্যান্য সাধারণ সৃষ্টির জন্য অভিনন্দন জানান। সম্ভবতঃ গোপাল হালদার এই উপন্যাসেরও একটি দীর্ঘ সমালোচনা লিখে তারাশঙ্করকে শুনিয়েছিলেন। পরে লেখাটি সত্যেন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 'অরণি' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আরও পরবর্তী সময়ে তারাশঙ্করের সঙ্গে এঁদের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হলে একই সমালোচক

একই উপন্যাসের সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এক সমালোচনায় লেখককে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেছিলেন। তারাশঙ্কর এতে মর্মাহত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন বিরুদ্ধ সমালোচনা বা অশালীন উক্তির দ্বারা প্রত্যাঘাতের চেষ্টা করেননি। বহুও কয়েক বছর পরে 'হাঁসুলী বাঁক' এবং 'মনুন্তর'এর বিরূপ সমালোচনা তাঁরা করেছিলেন। যার ফলে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র চেক অনুবাদ প্রকাশ করার একটা প্রচেষ্টা দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত, মুখ্যতঃ, এই প্রতিকূলতার জন্যই তা ফলবতী হতে পারে নি। অথচ ভারতীয় কমিউনিষ্টগণের উৎসাহের ফলেই উপন্যাসটির সংবাদ এদেশ থেকে সুদূর চেকোশ্লোভাকিয়ায় পৌঁছেছিল। ১৯৫৩ সালে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়ায় অনুষ্ঠিত প্রগতি সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। তাঁর উপস্থিতিতে কয়েকজন বক্তা এই উপন্যাসের কঠোর সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং এর সকল গুনের কথা অস্বীকার করে কতকগুলি অসমীচীন মন্তব্যে উপন্যাসটিকে কালিমা-লিপ্ত করেন।

কমিউনিষ্ট সমাজ সম্পর্কে তারাশঙ্কর তাঁর মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন একটি চিঠিতে। যেটি তিনি লিখেছিলেন তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারী পি. সি. যোশীর ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪৫ তারিখের একটি চিঠির জবাবে। এই চিঠিতে তিনি কোন দ্বিধা বা দ্বিমুখী মনোভাবের প্রশ্রয় না দিয়ে তাঁর মতবাদকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন —

"In spite of my best regards for you, I differ in my outlook from that of yours in some points. As regards your party policy I disagree with you in many points. But I admire the sincerity of the workers of your party and your boldness. I sincerely believe that everybody has the right of doing what he thinks just & right. You have done & are doing what you think right & just. My Creed is Ahimsa & Truth. Not to accuse anybody and to love all is my motto. I try always to remain true to my creed and motto of my life."

॥ জীবনের অনুর্বর পর্ব ॥

(১৯৪৭ – ১৯৫১)

তারাশঙ্কর তাঁর সমগ্র জীবনে অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা হলেও আলোচ্য পর্বে সৃষ্টির স্বল্পতা লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৭ – ১৯৫১ সালের মধ্যে তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত রচনা কেবলমাত্র দুখানি– 'হাসুলী বাঁকের উপকথা' এবং 'সন্দীপন পাঠশালা'। কারণগুলি সংক্ষেপে পরিবেশন করা হল (১) তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মধ্যেও দেশ, কাল ও মানুষ ও তাদের জীবন কামনার গভীরে এই সত্য প্রতিফলিত হচ্ছিল। তাই স্বাধীনতা প্রাপ্তির * পর সেই বহুলালিত উদ্দীপনার সমাপ্তি সূচিত হ'ল। অতএব স্বাভাবিক নিয়মেই নতুন সাহিত্যিক উপাদানের অন্বেষণে তাঁকে কিছুকাল অতিবাহিত করতে হ'ল। (২) ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংস্থার সম্পর্কে এসে তাঁর লাভ ও ক্ষতি দুইই হয়েছিল। একদিকে তাঁর চিন্তা ও পরিচিতির জগৎ প্রসারিত হয়েছিল এবং অপরদিকে মানুষের সীমাবদ্ধতা, মোহান্ধতা ও মতান্ধতা তাঁকে আঘাতে জর্জরিত করেছিল। তার ফলে বিপর্যস্ত মনের গভীরে এক শূন্যতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য তিনি ভাল কিছু লিখতে পারছিলেন না। (৩) ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁর মত বিবেকবান ও আশাবাদী মানুষকে প্রায় বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল। বহুদিন পোষিত বিশ্বাস চূর্ণীকৃত হওয়ায় মানসিক স্থিতিভাবের ভিতটুকুও আর অবশিষ্ট ছিল না।
(৪)* ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর অপমৃত্যু তাঁকে যেন সবলে এক অসহায়তার অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছিল। যুগে যুগে অশুভ অপশক্তির হাতে শুভ সত্য শক্তির এই পরাভবকে তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারেন নি। সে সময়ের দিনলিপির মধ্যে তাঁর অন্তরের বেদনাকে তিনি ধরে রেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন —

"মহাত্মাজী অহিংসার বেদীমূলে হিংসার উন্মত্ত ভ্রান্ত আদর্শবাদীর আক্রমণে, আঘাতে জীবন উৎসর্গ করেছেন। হে শান্ত, হে শুভ, হে অনন্ত পুণ্যের মূর্ত প্রতীক, তোমাকে প্রণাম। হে জিতেন্দ্রিয় হে জিতনিদ্র, হে জিতাহার, হে জিত সুখদুঃখ, হে অজেয় তোমাকে প্রণাম। তোমার ক্ষয় নেই, লয় নেই। ক্লান্তি, ব্যাধি জর্জরিত পৃথিবীতে তুমি শান্তির অমৃতভাণ্ড হস্তে ধন্বন্তরীর মত আবির্ভূত হয়েছিলে আমাদের মধ্যে। আমাদের ভ্রান্তি সত্ত্বেও তুমি আমাদের কর্মে, আমাদের মর্মে, আমাদের ধর্মে অক্ষয় হয়ে অবস্থান কর বুদ্ধের মত। তাঁরই মত সঞ্জীবিত হয়ে ওঠো নিত্য প্রভাতে

প্রতি মুহূর্তে।"

— দিনলিপি (৩০শে জানুয়ারী – ১৯৪৮)

(৫) সাময়িক রাজনৈতিক স্থানচ্যুতির ক্ষতিপূরণের জন্য প্রয়োজন ছিল সবলতর শক্তিশালী আশ্রয় যা লাভ করা সহজ ছিল না। (৬) তাঁর শারীরিক অবস্থায় অবনতি আর একটা বড় কারণ। অসুস্থতার চাপে তাঁর কর্মক্ষমতার সাময়িক হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। (৭) গান্ধীজীর মৃত্যুর পর সাময়িক ~~স~~ নাস্তিকতার অবসান হয় এবং আস্তিক্য চেতনার মধ্যে তিনি পুনরায় চিত্তের স্থৈর্য ও প্রশান্তির অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন।

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫১ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তারাশঙ্করের এই সব বই প্রকাশিত হয় (১) রামধনু (১৩৫৪), (২) শ্রেষ্ঠ গল্প (১৩৫৪), (৩) জলকন্যা (ঐ), (৪) সন্দীপন পাঠশালা (ঐ), (৫) পদচিহ্ন (১৩৫৭), (৬) কামধেনু (১৩৫৫), (৭) মাটি (১৩৫৭) (৮) আমার কালের কথা (১৩৫৮), (৯) উত্তরায়ণ (১৩৫৭), (১০) হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৩৫৪), (১১) যুগবিপ্লব (১৩৫৮), (১২) শিলাসন (ঐ), (১৩) তামস তপস্যা (১৩৫৮), (১৪) নাগিনী কন্যার কাহিনী (১৩৫৯)।

আলোর পাশে অন্ধকারের মত সম্মান ও অসম্মান পাশাপাশি বর্তমান থাকে। ১৯৪৯ সালে তারাশঙ্করের জীবনে চরম অপমান ও লাঞ্ছনার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঘটনাটি এতই গুরুতর যে, এতে তাঁর মৃত্যু হতে পারত। নিতান্ত দৈবক্রমেই তিনি বেঁচে যান। হাওড়া সেবা সঙ্ঘের রজত জয়ন্তী উৎসবে তিনি সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রিত হন। এই অনুষ্ঠানের তারিখ ছিল ১৯৪৯ সালের ১০ই এপ্রিল। গাড়ীতে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সেদিনের প্রধান অতিথি উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'সন্দীপন পাঠশালা'র চিত্ররূপ অবলম্বন করে হাওড়ার সাহিত্য সম্প্রদায় প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ছিল আগে থেকেই। অনুষ্ঠান শেষে তারাশঙ্কর যখন বাড়ীর পথে তখন স্বল্পালোকিত পথে তাঁর ওপর সুপরিকল্পিত ভাবে ~~স~~ নৃশংস আক্রমণ চালান হয়। এই ঘটনায় তিনি গুরুতর রূপে আহত হন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরে আসেন। পরে অবশ্য সাহিত্য সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি দেওয়া হয়। তারাশঙ্কর ঘটনাটিকে মানবজীবনের রুদ্রের প্রকাশরূপেই গণ্য করেছিলেন এবং প্রতিশোধের স্পৃহা মনে পোষণ করেন নি।

১৯৪৪।৪৫ সাল থেকেই তারাশঙ্কর পরোক্ষভাবে দিল্লীর জীবনের কাছে পরিচিতি লাভ করেন। যদিও একথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, ১৯৫৭ সালে দিল্লীতে

এশিয়ান রাইটার্স কনফারেন্স এর সূত্রে এবং পরে এম পি হিসাবে জীবনের শেষ পর্যায়ে দিল্লীর সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তিনি জড়িত হয়ে পড়েন। অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায় পরিবেশিত এক তথ্য থেকে জানা যায় যে, প্রধানতঃ সেন্ট্রাল টি বোর্ডের বিজ্ঞাপনের কল্যাণেই এই দশকের তারাশঙ্কর দিল্লীর সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক সমাজে ক্রমে পরিচিত হয়ে ওঠেন। এটি অবশ্য তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। এই সংহার প্রচার অধিকর্তা ছিলেন প্রভু গুহ ঠাকুরতা এবং পরে ডাঃ মণি মৌলিক। অনিলবাবুর ভাষায় বিষয়টি এইরকম :-

> "১৯৪৪।৪৫ সালে চা পান রত তারাশঙ্কর, চায়ের উৎসাহ বর্ধনকারী গুণের প্রশংসায় মুখর তারাশঙ্কর - এমনি একটি বিজ্ঞাপন সারা ভারতের পত্র পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। রাজধানীর সরকারী কর্তৃপক্ষদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়, সরকারী বাণিজ্যিক ও পণ্য উৎপাদন বিভাগের কর্মকর্তারা। সরকারী কর্মিক ও নানা শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে এক বিশিষ্ট বাংলা সাহিত্যিকের সর্বভারতীয় স্বীকৃতি প্রাথমিকভাবে চা সম্পর্কীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে হলেও তাঁর গুণগত মর্য্যাদা ও বৈশিষ্ট্যকেও মেনে নেন।"

এই পরোক্ষ প্রভাব ক্রমে প্রত্যক্ষ প্রভাবে রূপান্তরিত হয় এবং তারাশঙ্কর দিল্লীর সমাজের কাছে 'তারাজী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। একে একে হিন্দী, উর্দু, তামিল, মারাঠী ও গুজরাটী সাহিত্যিকগণ তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। চল্লিশের দশকেই তাঁর কিছু কিছু ছোটগল্প হিন্দীতে অনূদিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই অধ্যাপক হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তারাশঙ্করের 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি Epoch's End নামে অনুবাদ করলে তিনি সর্বভারতীয় পরিচিতি লাভ করলেন।

তারাশঙ্করকে একাধিকবার ভারতের বাইরে ও ভারতের নানা স্থানে যেতে হয়েছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক কারণে। একই সূত্রে তিনি একাধিকবার পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আসামে গিয়েছিলেন। ১৯৫৬ সালে আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই গৌহাটি কলেজে অনুষ্ঠিত বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে যোগদানের জন্য আসাম যাত্রা করেন। এর আগে ১৯৪৪ সালে তাঁকে নিখিল আসাম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে শিলং যেতে হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে মূল সভাপতি ছিলেন এস ওয়াজেদ আলি সাহেব। এবং তারাশঙ্কর ছিলেন সাহিত্য শাখার সভাপতি। নানা কারণে

এই সম্মেলন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল । কারণ,আসামের ভাষা সমস্যার সূত্রপাত হয়েছিল তার আগেই । একদিকে ছিল আসামের প্রভূত সংখ্যক বাঙালীর বাংলা ভাষা বিষয়ক স্বাধিকারের প্রশ্ন ,অপরদিকে ছিল প্রাদেশিক ভাষা অসমীয়ার প্রতিষ্ঠার দাবী ।পরাধীন ভারতে ভাষা সমস্যার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকলেও আসামের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-গণের পরিচালনায় ভাষা আন্দোলন ধীরে ধীরে একটা নিজস্ব রূপলাভ করছিল । ভাষা-ভিত্তিক প্রাদেশিক পুনর্গঠন এর সম্ভাবনা থাকলেও শিলচর ও কাছাড়ের বাঙালী প্রাধান্য বিষয়টিকে পরেও জটিল করে তুলেছিল । অসমীয়া ভাষা প্রধান কামরূপ বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রভুত্ব থেকে বাংলা ভাষাকে বাঁচাবার জন্য আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনার প্রস্তাব ১৯৪৪ এর নিখিল আসাম বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেই গৃহীত হয়েছিল । কিন্তু কাছাড়ের অধিবাসীদের উপযুক্ত সক্রিয়তার অভাবেই তা বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে নি ।

১৯৫৬ সালের সম্মেলনে যখন তিনি উপস্থিত, তখন পূর্ব অবস্থায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে । এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণের বৈশিষ্ট্য তারাশঙ্করের লেখা থেকেই পাওয়া যেতে পারে । এই ভাষায় দিয়েছিলেন তৎকালীন আসামের শিক্ষামন্ত্রী ।

> "তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতার মধ্যে যে উত্তাপ তাঁর উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের মধ্য থেকে বিকীর্ণ হচ্ছিল । ....১৯৫৬ সালে গৌহাটি সম্মেলনে আসাম মন্ত্রীসভায় শিক্ষা মন্ত্রীর মুখে সেদিন গৌহাটির বাঙালী ছাত্রদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বাংলা সাহিত্য সম্মেলনে কঠোর কিছু সতর্কবাণী অপ্রত্যাশিত ছিল না । আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে তাঁর উক্তির মধ্যে তাঁর উক্তির প্রতিবাদও করেছিলাম[১]।"

তারাশঙ্কর সর্বদাই এই সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন । ১৯৬০ সালের কলকাতায় আসামের ঘটনার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তারাশঙ্কর তার মধ্যেও জড়িত হয়ে পড়েছিলেন । তবে কোন অবস্থাতেই তিনি শুভবুদ্ধি হারিয়ে চরম সঙ্কীর্ণতার প্রশ্রয় দিয়ে নিজেকে হীন করে তোলেন নি । কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে যে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তারাশঙ্কর তার সভাপতি হয়েছিলেন । এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, মনোজ বসু, সৌম্যেন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি।সভাতে অধিকাংশ বক্তা যেখানে বক্তব্য প্রকাশ হিংসার আশ্রয় গ্রহণের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তারাশঙ্কর সেখানে তার প্রতিবাদে বলেছিলেন –

"এ সভার সভাপতিত্ব করতে আমি পারব না । কারণ, সংসারের বর্বরতার প্রতিবাদে বর্বর হব – এই সঙ্কল্প গ্রহণ করে ঘোষণা করবার জন্য কোন সভা-সমিতির প্রয়োজন হয় না ।" [১২]

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই তারাশঙ্কর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তা দীর্ঘায়িত হয় ।

॥ অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ॥

মহৎ মানুষের জীবন সত্যের পরীক্ষাভূমি । তারাশঙ্করও তাঁর জীবনের বিবিধ স্তরে সাহিত্য সাধনা ও অন্যবিধ কর্মানুষ্ঠানে জীবনের অবলম্বনীয় সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থেকেছেন । এই সত্য সন্ধিৎসা তাঁর কাছে ছিল সাধনার বিষয় । চল্লিশের দশকের প্রথম অর্ধাংশে কমিউনিস্ট প্রভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন নিরীশ্বরবাদী । এবং সেই সূত্রে পূর্ববর্তী ঈশ্বর বিশ্বাসকে সাময়িকভাবে ত্যাগ করেছিলেন । ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংস্থার সঙ্গে সব সম্পর্কের অবসানের পর তিনি পুনরায় ধর্ম বিশ্বাসের জগতে প্রত্যাবর্তন করেন । ১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর মৃত্যু এর সহায়ক হয় । তাঁর মনে জেগেছিল এই জিজ্ঞাসা – "মার্কসবাদের নাস্তিকতার সূত্রটি আমাকে সূচের মত বিদ্ধ করত । তার অন্য কোন তত্ত্বের বা সূত্রের সঙ্গে আমার বিরোধ নেই । কিন্তু নাস্তিই যদি সত্য হয়, তবে জীবনকেই বা অস্তি বলে ধরে নিই কেমন করে ?" এই প্রশ্নের উত্তরের অন্বেষণে তিনি ব্যাকুলভাবে পরবর্তী কয়েক বৎসর নিজেকে অনেকখানি বাস্তব বিরহিত করে রাখেন । গান্ধীজীর মৃত্যুর পর খাদ্য তালিকা থেকে তিনি মাছ মাংস ইত্যাদি আমিষ খাদ্য-সামগ্রী বাদ দিয়েছিলেন এবং এই অভ্যাস ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন । চীন যাত্রাপথে রেঙ্গুন বিমান বন্দরে গুরুতর রূপে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হন । তখন চিকিৎসকের পরামর্শে ও বিশেষ অনুরোধে পুনরায় আমিষ খাদ্য গ্রহণে সম্মত হয়েছিলেন । আধ্যাত্মিকতার সূত্রেই এই সব ঘটনা ঘটেছিল । কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন – চিত্ত শুদ্ধির জন্য বিশেষ শ্রেণীর আহার্যের প্রয়োজন এবং সাত্ত্বিক ভাবের জাগরণের জন্য নিরামিষ আহারই প্রশস্ত ।

১৯৫০ সাল থেকে তারাশঙ্কর নিয়মিত ভাবে আনুষ্ঠানিক দেবার্চনা শুরু করেন । এর মূলে ছিল একটি স্বপ্ন যাতে নাকি তিনি স্বর্গত পিতৃদেব কর্তৃক অনুরূপ বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছিলেন । নিয়মিত পূজা পদ্ধতি এবং আনুষ্ঠানিক ঈশ্বর আরাধনার মধ্যে তিনি

বাস্তব জীবনের রুঢ়তা, অসম্পূর্ণতা ও যন্ত্রণা থেকে দূরে সরে গিয়ে এক শান্তিপূর্ণ আশ্রয়লাভ করে তৃপ্তি পেতেন। ধর্মসাধনা ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ফল। তা নিয়ে কোন মন্তব্য অনুচিত হলেও অনেক সময়েই তাঁকে নানা মানুষের কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবে সেজন্য তিনি আপন পথ থেকে বিচ্যুত হন নি। ১৯৫১ সালে গান্ধী জয়ন্তী অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁকে যেতে হয়েছিল কাঁদী পাঁচথুপী। সেখানে একাধিকবার বিচিত্র ও রহস্যময় দৈব অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সাধারণ বুদ্ধিতে এইসব অলৌকিক বিষয়ের বিচার সম্ভব নয়। এই ঘটনায় তিনি বেশ বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। বাইরের দিক থেকে তাঁর মধ্যে যে পরিবর্তন এল তা সামান্য। কিন্তু, তাঁর অন্তরে যা ঘটল, তাকে এক কথায় বলা চলে -বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই বিশিষ্ট জীবন জিজ্ঞাসা ও মহৎ প্রাপ্তির প্রতিফলন হল তাঁর সমকালীন সৃষ্টি 'আরোগ্য নিকেতন'এ। "তাঁর নিজের মত ঐ সময়কার ও ঐকান্তিক আকূতির সবটুকুই তিনি সাফল্যের সঙ্গে জীবন মশায়ের চরিত্রের মধ্যে সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি বলেছেন -

"আমার এই সময়ের যে মন, এবং অন্তরের যে বেদনা তা জীবন মশায়ের চরিত্র ও জীবনের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছি, এইটুকু আমি বলব।"[১৩]

॥ পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে অভিনন্দন ॥

১৩৫৪ (১৯৪৭) সালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চাশ বছর বয়সে পদার্পণ করলে তাঁর প্রধানতম গুণগ্রাহী সজনীকান্ত দাশ একটি ~~ব~~ অনাড়ম্বর অথচ আন্তরিক ও ঘরোয়া - অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় ১৩৫৪ সালের ৮ই শ্রাবণ তারিখে। এই সভায় সেদিন বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে সজনীকান্ত স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন এবং যে প্রারম্ভিক সঙ্গীত গীত হয় সেটিও তিনি রচনা করেন। গান ও কবিতার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল -

॥ গান ॥

ভালবাসা দিয়ে বাঁধি বন্ধুরে, প্রেমের গর্বে লই যে নাম,
প্রতিভাদীপ্ত মধ্য আকাশে খ্যাতের ফুলের লও প্রণাম।
প্রসন্ন হাসি ভাসুক এবার
মথিত অবশ সৌরভ ভার
মোদের কামনা, নিদাঘ দিনের হোক রমণীয় এ পরিণাম।

॥ কবিতা ॥

তারাশঙ্কর ,

অর্দ্ধেক শতাব্দী ধরি জীবধাত্রী ধরিত্রীর স্নেহ
তোমারে করেছে রক্ষা, মাটিরে করনি অস্বীকার –
এড়াতে পেরেছ তাই সর্বনাশা যুগের সন্দেহ,
ভালবাসা প্রীতি হল , প্রেম হ'ল রক্ষী প্রতিজ্ঞার ।
আমাদের দুঃখ দৈন্য আমাদের বিক্ষোভ শঙ্কার
তুমি বার্তাবহ বন্ধু, দিতেছ সার্থক বাণী দেহ –
সর্বহারা গৃহহারা স্বার্থের সংঘাতে বারম্বার
রচিছে কল্পনা তব, আমাদের ভবিষ্যৎ গেহ ।

ইত্যাদি ।[১৪]

কয়েকজন সাহিত্যিক সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত হতে না পারায় লিখিত অভিনন্দন পাঠিয়েছিলেন, এঁরা হলেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন —

"বাংলায় ভাগ্য বিপর্যয়ের ভীষণ সময়ে শঙ্কর ভাণ্ডার মত যাঁরা সাহিত্যের ভিতর দিয়ে দেশ সেবার কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছেন, দেশের ভাবধারাকে সকল সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে সর্বসাধারণের কল্যাণের পথে ও পরিচালিত করে তাঁরা যে ব্রতের উদযাপন করুন – এই প্রার্থনা করি ।"

আর দুজন প্রখ্যাত সাহিত্যিকের অভিনন্দনের অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ—

(ক)....."যশোর জেলায় অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমি তারাশঙ্করকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি, তার শুভ জন্মদিনে । বহুদিন ধরে এই দিনটি বারবার ফিরে আসুক, সে শত শরৎ পরমায়ু নিয়ে বঙ্গবাণীর দেউলকে দিন দিন নবতর অর্ঘ্যে মণ্ডিত করুক, দেশ ও জাতিকে নতুন পথের নির্দেশ দিয়ে চলুক তার প্রতিভা মণ্ডিত লেখনী ।"

—— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

(খ) " আমাদের সকলের সাহিত্য সাধনা তোমার মাধ্যমে আশাতীত পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, আমাদের যাহা সাধ ছিল, তোমার ক্ষেত্রে তাহা ম সাধ্য হইয়াছে ।.....বাঙালী সাহিত্যিক সমাজের তুমি সেই প্রতিভা ভাস্বর

শিখা। তুমি আমাদেরই পূর্ণ স্বরূপ। এই জন্মতিথি উপলক্ষে যে শুদ্ধা তুমি সাধারণের নিকট হইতে পাইবে, তাহার সঙ্গে আমার এই পরম প্রীতির ক্ষীণ ধারাটি যোগ করিয়া দিয়া ধন্য হইলাম।

—— প্রমথনাথ বিশী

এই আন্তরিক সংবর্ধনার উত্তরে তারাশঙ্কর সেদিন বলেছিলেন –

"....শ্রেষ্ঠত্বের দাবী আমার নয়। এই যুগ অনেক জনের কীর্তিতে সমৃদ্ধ, একক কারও যুগ এ নয়। ....আজ মনে হচ্ছে এই দেশে জন্মলাভ করেছি পরম সৌভাগ্যের ফলে। আমার জীবনসাধনার মূল্য এমন স্নেহে, শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় পেয়ে জন্মকে সার্থক বলে মনে করছি। সম্মান নয়, যশ নয়, ভালবাসাই মানুষের জীবনের পরম কামনার ধন। ....আপনাদের আমি প্রণাম জানাই। দানগ্রহণকারী পরিপূর্ণ চিত্তায় যে অধিকারে আশীর্বাদ জানায়, সেই অধিকারে আশীর্বাদও জানাই, আপনারা জয়যুক্ত হউন। ... বন্দে মাতরম্.।"

১৯৫০ সালের ১৫ই নভেম্বর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। এই মহৎ জীবনের অবসানের সূত্রে স্মৃতি তর্পণ ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়েছিলেন প্রায় সকল বাঙ্গালী সাহিত্যিক একবার কলকাতায় আথরায় বাটশীলায়। সাহিত্যিক গজেন্দ্র কুমার মিত্র প্রভৃতির উদ্যোগে ঘাটশীলায় বিভূতিভূষণের স্মৃতি রক্ষায় যে আয়োজন হয় তাতে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ ভিন্ন রুচি ও মতাদর্শের হওয়া সত্ত্বেও এক দুর্লভ নিবিড় ঐক্য অনুভব করেছিলেন। এই সত্যানুভবের স্বরূপ কি? তারাশঙ্করের ভাষায় – 'বিভূতিভূষণের সঙ্গে কারুর প্রতিযোগিতা ছিল না – সাহিত্যের জগতে বা ভাবরাজ্যে এমন একটি পথ তিনি বেছে নিয়েছিলেন বা তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতিবশে এমন একটি দিগন্তের হাতছানিতে সেই মুখে হেঁটেছিলেন। সে পথে রাজপথের মিছিল ছিল না, দ্রুত হেঁটে আগে চলার ছোটাছুটি ছিল না, প্রাসাদ অট্টালিকায় সজ্জা ছিল না, কলরব ছিল না, ছিল অরণ্য প্রান্তর বা নির্জন শান্ত গ্রাম। ছিল ফুলের শোভা, পাখীর কলরব, ঝিঁঝির ডাক, ঝরণার ঝর ঝর শব্দ, অরণ্য পুষ্পের গন্ধ –যার মধ্যে চলতে চলতে প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হয় – তিনি সম্মুখে খুলে দেন সেই আনন্দময় জগৎ এবং রূপ রস গন্ধ জগতের আদিম সঙ্গীত, যা নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টির আদি থেকে অনু পর্যন্ত বেজেই

চলবে। এ পথে তিনি বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আসরে নয়, জগতে একক যাত্রী ছিলেন।"

বিভূতিভূষণের মৃত্যু যেমন তারাশঙ্করকে এক নতুন উপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়, তেমনি আর এক দিকে তাঁর পিসীমার মৃত্যু (১৯৫০ সালের জুন মাসে) জীবনে এক গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করল। পিসীমা ছিলেন তাঁর জীবনে 'ধাত্রী দেবতা'। তাই তাঁর মৃত্যুতে তিনিযেন অনেকখানি নিরাশ্রয় হয়ে পড়লেন। তিনি অনুভব করলেন, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর শৈশবে দেখা পুরাতন যুগের অবসান হল। তারাশঙ্করের মায়ের হাতে হাতটি রেখে মহাপ্রয়াণ করলেন তিনি সময়টা ১৯৫০ সালের জুন মাস। মৃত্যু শেষে থেকে গেল শুধু তাঁর ভাবময় অস্তিত্ব এবং উজ্জ্বল স্মৃতিময় অতীত।

॥ তৃতীয় পর্বের রাজনৈতিক জীবন ॥

রাজনৈতিক বিশ্বাস ও আচরণ তারাশঙ্কর জীবনের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। তাঁর অনুরাগের সেবা প্রবণতাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব দিনগুলোতে তাঁর কর্মধারা যুক্ত ছিল সমাজসেবা ও দেশ ভাবনামূলক প্রচেষ্টার সঙ্গে। জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে – তিনি সাম্যভাবযুক্ত রাজনৈতিক দলের চিন্তা ও কাজের অংশীদার হয়ে পড়লেন। পরে মোহের কুহেলিকা অপসারিত হলে দেখা গেল সেখানে অনেক অন্ধতা, মূঢ়তা ও গোঁড়ামি রয়েছে। অন্তর বিনা দ্বিধায় তিনি নিজেকে সরিয়ে আনলেন। কিন্তু এর হাত থেকে মুক্ত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। অর্থাৎ কোন না কোন দিক থেকে রাজনীতি তাঁকে আবিষ্ট করে রাখল এবং শীঘ্রই তিনি নতুন আমুয়লাতে তৎপর হলেন। ১৯৫২ সালে কলকাতায় হ'ল সর্বভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। তারাশঙ্কর হলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সংস্কৃতি শাখার সভাপতি। এই অধিবেশনে পণ্ডিত নেহরু উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সংস্কৃতি শাখায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। এই অনুষ্ঠানে তারাশঙ্কর একটি লিখিত ভাষণে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্কটের চরিত্র নির্ণয় করেন এবং তাঁর মত ও সিদ্ধান্তকে রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে ব্যাখ্যায়িত করেন। এর একদিকে ছিল তাঁর আজন্ম লালিত অহিংস জীবনাদর্শের সংস্কার এবং অপরদিকে ছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে অতিবাহিত দিনগুলোর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। সাহিত্যে বাস্তব বাদের

নামে যে কলুষতা ও পশুত্বের প্রকাশ তার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল হওয়ার জন্য তিনি লেখক সমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৯৫২ সালে তারাশঙ্কর পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক বিধান পরিষদের সভ্য মনোনীত হন। তিনি এই মনোনয়ন সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। বিধান পরিষদের জীবনে তিনি তিনজন ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন, এঁরা হলেন রবীন্দ্রলাল সিংহ, হরিকুমার চক্রবর্তী, এবং মনোরঞ্জন গুপ্ত। তিনি একই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন দীর্ঘ আট বৎসর। একাধিকবার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় নি। ১৯৫৩ সালের ২৫শে মে তারিখে Estate Acquisition Act কার্যকরী রূপে গৃহীত হয়। এতে তারাশঙ্করের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তিনি জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দানের সমর্থনে তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেছিলেন। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সময় তিনি অবশ্য ব্যক্তিগত ভাবে অর্থ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ভূদানযজ্ঞ সূত্রে বিনোবাজীর বাঁকুড়া পরিক্রমার সময় একটি দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন।

১৯৫৬ সালে দিল্লীতে এশিয়ান রাইটার্স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এই লেখক সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন প্রধানতঃ রাশিয়া ও চীন এবং ভারতের পক্ষ থেকে প্রাথমিক উদ্যোক্তা ছিলেন – ডঃ মুলক রাজ আনন্দ বানারসী দাস চতুর্বেদী ও নৈনেন্দ্রকুমার। বাংলা দেশে উদ্যোক্তা কমিটির শাখা গঠনের দায়িত্ব অর্পিত হয় তারাশঙ্করের ওপর। এই অনুষ্ঠানে বাংলা দেশ থেকে যোগ দিয়েছিলেন গোপাল হালদার, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বাণী রায়, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেব ইত্যাদি এবং সর্ব ভারতীয় ব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণলাল শ্রীধরণী এবং সুমাযুন কবীর। ভারতীয় লেখক গোষ্ঠীর নেতা নির্বাচিত হন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাথমিক অনুষ্ঠানে তারাশঙ্করের মত অপর অনেক সাহিত্যিকের মনে হয়েছিল –

"এর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রূপে রাজনৈতিক। এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে যেখানে যত মার্কসবাদী সাহিত্যিক আছেন, তাঁরাই এ সম্মেলনে মিলিত হয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করবেন, যার উদ্দেশ্য হবে মার্কসবাদ প্রচার বা তার থেকে আরও স্পষ্ট করে বলতে হলে বলতে হবে যে, প্রচারের সাহায্যে অকম্যুনিষ্ট এশীয় দেশগুলির মধ্যে কম্যুনিষ্ট সরকার স্থাপনের উদ্যোগে জনসাধারণকে প্রবুদ্ধ করা।"

– চীন সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে চীনে যান ১৯৫৭ সালে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় তাসখন্দে এশিয়ান রাইটার্স কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৮ সালে। এর প্রস্তুতি কমিটিতে ছিলেন তারাশঙ্কর ও মুল্করাজ আনন্দ, চীনের দুজন প্রতিনিধি, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের দুজন, জাপানের একজন এবং রাশিয়ার চারজন মোট এগারজন প্রতিনিধি।সভাপতিত্ব করেছিলেন উজবেকিস্তানের খ্যাতনামা লেখক, সেখানকার সোভিয়েটের প্রেসিডেন্ট এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের অন্যতম সহ সভাপতি ঐ রশিদভ। মস্কোতে এই উপলক্ষে ভারতীয় ডেলিগেশন পাঠাবার ব্যাপারে যাতে দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমী দায়িত্ব গ্রহণ করেন, সেজন্য তারাশঙ্কর নেহরুজীকে অনুরোধ করেছিলেন। এই সাহিত্যিক সম্মেলনে যাতে রাজনীতি তার প্রভাবের হাত না বাড়ায় সেজন্য তারাশঙ্কর প্রথম থেকেই সর্তক ছিলেন এবং উদ্যোগপর্বে রাশিয়ায় গিয়ে সে বিষয়ে যথাসাধ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। পরে সম্মেলন চলার সময় তারাশঙ্করকে যোগদানকারী . কটি দেশের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রভাব সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। রাজনীতিকে বাদ দিয়ে যাতে কেবল-মাত্র সাহিত্যিক উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয় সেকথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন –

"The spirit of the writer is the song of freedom. We have fought against Colonialism & we will Continue to fight against it. We go even farther. We oppose any form of domination of one Country by another. Yet as we see the focus of this Conference should be literary & not political."

হুমায়ুন কবীর তারাশঙ্করের মতবাদের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁকে একটি চিঠি লিখে-ছিলেন। ১৯৬০ সালে কায়রোতে অনুরূপ একটি সাহিত্যিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে দেখা গেল, সাহিত্যের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ সম্পর্কে একদা আশঙ্কা পোষণ করে তিনি যে সর্তকবাণী উচ্চারণ করেছিলেন ,তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয় All India Writers' Conference এতে সভাপতি নির্বাচিত হন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। সভাপতির অভিভাষণের একাংশে তিনি বললেন – "We believe that although the writer Can not ignore the political struggle,

he has a deeper Obligation to himself & to humanity, which is to liberate the spirit of man through excellence of Creation."

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্যপদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৬০ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে এবং ভারতীয় পার্লামেন্টে রাজ্যসভার সদস্যপদে মনোনীত হন ১৯৬০ সালের ১লা এপ্রিল। এই কার্যকাল অব্যাহত থাকে পরবর্তী দু'বছর। অবশেষে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৬৬ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে। এই দীর্ঘ সময় ধরে তিনি তাঁর সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুণ্ণ রাখেন এবং পূর্ব নির্দিষ্ট পথে চলতে চেষ্টা করেন। আলোচ্য কালকে আমরা তারাশঙ্করের রাজনৈতিক জীবনের শেষ পর্ব বলে চিহ্নিত করতে পারি। ১৯৬১ সালে আসামের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে দুর্বিপাকের সূচনা হয় তাকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, হিংসাত্মক মনোভাব ও প্রতিশোধ চেতনার পরিচয় দিলেও তারাশঙ্কর সর্বভারতীয় ঐক্যের কথা বিবেচনা করে সহিষ্ণুতার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ভাষায় প্রশ্নে তিনি ছিলেন মাতৃভাষা প্রেমিক এবং আপন আপন ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের অধিকারকে তিনি জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সত্য বলে মনে করতেন। পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলনের প্রতি তাই তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল এবং সেখানে যখন বাংলা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে, তিনি তখন প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৬২ সালের চীন ভারত যুদ্ধের সময় তারাশঙ্করের চীন বিষয়ক আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয় এবং ঘটনার মধ্যে তাঁর পূর্বপোষিত মতের প্রতিফলন দেখতে পান। এই ঘৃণ্য পররাজ্য আক্রমণের মধ্যে চীনের মুখোশ যেভাবে উদঘাটিত হল তার মর্মসত্য বিচার করে তিনি যে বই লিখলেন তা 'ভারতবর্ষ ও চীন' নামে ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ সালে চীন ভ্রমণের সময় তিনি যেন এই ঘটনার পূর্বাভাস লক্ষ্য করেছিলেন। তারাশঙ্কর তাঁর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে নিজস্ব মত প্রকাশে সর্বদা সংশয় বিমুক্ত এবং অকুণ্ঠচিত্ত থেকেছেন এবং তাঁর বিবেচনায় যতটুকু সত্য বলে মনে হয়েছে তা সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ করার মত সাহস তাঁর ছিল।

॥ স্বদেশ ও বিদেশে স্বীকৃতিলাভ ॥

রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে একালের ভারতে তারাশঙ্করই সম্ভবতঃ একমাত্র সাহিত্যিক যিনি তাঁরা সমগ্র জীবনে বহুবিধ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি অনুহীন সৌভাগ্যের অধিকারী। বরেণ্য লেখক হিসাবে তিনি বারবার নানা সাহিত্য সভা ও সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়েছেন এবং সাহিত্যিক কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ভারতের প্রায় সব কটি সাহিত্যিক পুরস্কারও লাভ করেছেন। তারাশঙ্করের সম্মান প্রাপ্তির বিষয়টি দুটি ভাগে বিভক্ত করে তালিকার আকারে সন্নিবেশ করলাম।

॥ সভা, সমিতি ও সম্মেলন ॥

(১) কানপুর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

সাহিত্য শাখার সভাপতি — ১৯৪৪

(২) প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন — বোম্বাই

রজত জয়ন্তী অধিবেশন — ১৯৪৭

(৩) চীনা লেখক লু সুনের জন্ম জয়ন্তী অনুষ্ঠান

চীন সরকারের আমন্ত্রণ — ১৯৫৫

(৪) ঐ — চীন ভ্রমণ — ১৯৫৬

(৫) এশীয় লেখক সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আমন্ত্রণ

মস্কো গমন — ১৯৫৭

(৬) এশীয় লেখক সম্মেলন — তাসখন্দ — ১৯৫৮

ভারতীয় লেখক দলের নেতা নির্বাচিত

(৭) সর্ব ভারতীয় লেখক সম্মেলন — মাদ্রাজ — ১৯৫৯

সভাপতি মনোনীত

(৮) নৃপেন্দ্র চন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা

বিশ্বভারতী — ১৯৭১

(১০) ডি.এল.রায় স্মৃতি বক্তৃতা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — ১৯৭১

॥ সম্মান সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রাপ্তি ॥

(১) পঞ্চাশৎ জন্ম জয়ন্তী সংবর্ধনা – ১৯৪৭

(২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শরৎ স্মৃতি পদক দান – ১৯৪৭

(৩) রাজ্যপাল কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের সদস্য মনোনয়ন – ১৯৫২

(৪) রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ – ১৯৫৫

(৫) আকাদেমী পুরস্কার লাভ – ১৯৫৬

(৬) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পদক – ১৯৫৯

(৭) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত – ১৯৬০

(৮) 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ – ১৯৬২

(৯) শিশিরকুমার পুরস্কার প্রাপ্তি – ১৯৬৩

(১০) জ্ঞানপীঠ পুরস্কার (১৯৬৬) – ১৯৬৭

(১১) মহাজাতি সদনে গুরুত অভিনন্দন – ১৯৬৭

(১২) 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ – ১৯৬৮

(১৩) কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক সংবর্ধনা – ১৯৬৮

(১৪) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট – ১৯৬৮

(১৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট – ১৯৬৮

(১৬) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট – ১৯৬৯

(১৭) সাহিত্য আকাদেমীর ফেলো নির্বাচিত – ১৯৬৯

(১৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি – ১৯৬৯

(১৯) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট (মরণোত্তর) – ১৯৭১

॥ জ্ঞানপীঠ পুরস্কার ও তারাশঙ্কর – ১৯৬৭ ॥

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই পুরস্কারের মধ্য দিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর অসামান্য সাহিত্য – প্রতিভার স্বীকৃতি পেলেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, তারাশঙ্করকে এভাবে সম্মানিত করে সমগ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকেই বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হল। তারাশঙ্কর ১৯৬৬ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করেন ১৯৬৭ সালে। তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসের

ওপর ভিত্তি করে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ভারতীয় সাহিত্যের ক্রমবর্ধমান ধারায় 'গণদেবতা'র স্থান নিরূপণ প্রসঙ্গে তাঁকে প্রদত্ত প্রশংসাপত্রে লেখা হয় —

"The literary award of Rupees One Lakh is hereby presented by Bharatiya Jnanpith to Syt. Tarashankar Bandyopadhya for 1966 for his novel in Bengali 'Ganadevata' adjudged as best creative literary work published in Indian languages during 1925-59.

'Ganadevata' is a prose-epic depicting the transitional period in the life of rural India, when traditional culture-values and economic structure were shaken to roots in the wake of onset of industrial revolution, occasioning changes in life's pattern and furnishing new contexts for expression of human emotions.

The author is a literary visionary-cum-realist devoted to the quest of life's fundamental truth. His instinctive sympathy with the human predicament of the co-existence of the sublime & the vile is reflected in his variegated characters set in diverse environments. His works have laid a standard of measure not only for the achievements of Bengali literature but for Indian literature as a whole. May he live long.

New Delhi
Dec. 15, 1967

অধ্যক্ষ
প্রবর পরিষদ

অধ্যক্ষ
ভারতীয় জ্ঞানপীঠ

তারাশঙ্করের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য একটি সচিত্র পরিচয় পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই পুস্তিকায় তারাশঙ্করের সাতটি বিভিন্ন আলোকচিত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অনেকগুলি আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। ১৯৬৭ সালের ১১ই মে তারিখের 'সিলেকশন বোর্ড'-এর যে সভায় 'গণদেবতা' চূড়ান্ত নির্বাচন লাভ করে তাতে অংশগ্রহণকারীগণ হলেন — ডঃ করণ সিং, আচার্য কাকা কালেলকর, শ্রী লক্ষ্মীচন্দ্র জৈন, শ্রীমতী রমা জৈন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ডঃ আর. আর. দিবাকর, ডঃ গোপাল

নেতৃত্বী, ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব, ডঃ সম্পূর্ণানন্দ, ডঃ কে.জি.সয়্যাদীন এবং মহাকবি জি. শঙ্কর কুরুপ। এঁদের মধ্যে ডঃ সম্পূর্ণানন্দ ছিলেন সভাপতি।

এই পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে তারাশঙ্কর ১৯৬৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে জ্ঞানপীঠ আয়োজিত সভায় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়েছিলেন। এই ভাষণের নির্বাচিত অংশ এখানে উপস্থাপিত হল:-

"এই সর্বভারতীয় মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি একই সঙ্গে হর্ষ, অহংকার ও সঙ্কোচ অনুভব করছি। ....আমি নিশ্চিত জানি, আমার এ সমাদরের কারণ হ'ল, আমাকে উপলক্ষ করে আমাদের পরম সমাদরের বাংলা সাহিত্যকে বাংলা সাহিত্যকে সম্মানিত করা, যে বাংলাসাহিত্য জয়দেব, চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ও আরও বহু বিশিষ্ট সাহিত্য সেবকের সেবায় সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে এবং আসছে। .... বাংলা সাহিত্যের হাত দিয়ে সমাদর করা হয়েছে সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যকে।

আসমুদ্র হিমাচল পরিব্যাপ্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার, বিভিন্ন আহার, বিভিন্ন পরিচ্ছদ, বিভিন্ন আবহমণ্ডল। তা সত্ত্বেও এই সব বিভিন্নতার অন্তরালে একটি সর্ব ভারতীয় ঐক্যসূত্র সমগ্র ভারতের হৃদয় যেন গাঁথা আছে। এই হ'ল অখণ্ড ভারত সংস্কৃতি।..... আমার কাছে ধারাবাহিক মানব সংস্কৃতি যেন একটি গাছের মত। তার জন্ম মৃত্তিকার অন্তঃপুরে, গভীর অন্ধকার লোকে পঙ্করসের মধ্যে। এর মধ্যে জন্মে ও সেই রসে বৃদ্ধি পেয়ে তার অভিসার আকাশলোকে আলোর দিকে। ....

আমার মনে হয়, ভারতীয় জ্ঞানপীঠ ও তার বিচারক মণ্ডলী যে রচনাটি-কে সম্মানিত করবার জন্য আজকের এই আয়োজন করেছেন, সেই রচনাটির মধ্যে তাঁরা সর্ব ভারতীয় জীবনের চিত্রায়ন লক্ষ করেছেন বলেই রচনাটিকে সম্মানিত করেছেন। .....

আমাদের চলিত শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের আলোকোজ্জ্বল পাদপ্রদীপের অন্তরালে ও বহির্দেশে আমাদের অগোচরতার ছায়ায় যে বৃহৎ, প্রাচীন, বৃদ্ধ, সনাতন ভারতবর্ষ অতি দীর্ঘকাল ধরে অতি নীরবে গভীর প্রশান্তি ও ধৈর্য্য নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্ক

আরও বিচ্ছিন্ন । হয়তো সে বিচ্ছিন্নতার ব্যবধান দিন দিন ব্যাপকতর হয়ে উঠেছে । .....বঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে পাঞ্জাব, বোম্বাই, গুজরাটে একই জীবন নিজের রক্তধারায় ও হৃদ্‌স্পন্দনে একই নিঃশব্দ মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছে । .....

উপায় হয়তো এইখানেই নিহিত । দেশের এই আলোকিত ও ছায়াবৃত দুই পৃথক জীবনকে পরস্পরের সান্নিধ্যে এনে প্রেমের ও বিশ্বাসের সূর্যালোকে যদি বন্ধনের পথ আবিষ্কার করা যায়, তাহলে আমাদের সংস্কৃতির এক বৃহৎ জীবন ক্ষেত্রে মুক্তি হয়তো সম্ভব হবে । ...সেদিন ভারতবর্ষের যে প্রান্তেই যে প্রাদেশিক ভাষাতে যে সাহিত্যই রচিত হবে, সে এক মুহূর্তেই সর্বভারতীয় সাহিত্য হয়ে উঠবে । সেই সর্বভারতীয় সাহিত্যমূর্তির মধ্যে সার্বভৌম মানুষের চিরকালের রূপকেই শুধু প্রত্যক্ষ করব না , তার মধ্যে তাঁকেও প্রত্যক্ষ করব যিনি জনানং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ, সেই জনার্দনকেও ।"

তারাশঙ্করের এই সর্বভারতীয় পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ ভারতের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে পরিবেশিত হয় । এই সব পত্রিকা হ'ল (১) অমৃতবাজার পত্রিকা (২) আনন্দবাজার পত্রিকা (৩) যুগান্তর (৪) টাইমস অব ইণ্ডিয়া (৫) স্টেটসম্যান (৬) নবভারত টাইমস. (৭) হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড (৮) দেশ (৯) অমৃত (১০) শনিবারের চিঠি প্রভৃতি । স্থানাভাববশতঃ কয়েকটি পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে অতি সংক্ষিপ্ত অংশ এখানে উদ্ধৃত হল ঃ-

(১) "১৫ই ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভারতীয় জ্ঞানপীঠ কর্তৃক দ্বিতীয়বর্ষের পুরস্কার প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্পিত হইয়াছে । .....ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনান্তে আমরা ভারতীয় জ্ঞানপীঠের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি ।" —— শনিবারের চিঠি (অগ্রহায়ণ ১৩৭৪)

(২) "This year the Jnanpith Literary Award of one lakh rupees has been won by Bengal. Shri Tarashankar Banerjee the celebrated novelist on the eve of the 70th birthday

got this prize for his monumental work 'Ganadevata' written more than 20 years ago. Tarashankar's Contribution to Bengali Literature is an acknowledged fact. Certainly he is the foremost writer in India who has invested his novels with a flavour of the soil & human warmth."

— Amrita Bazar Patrika.

(৩) "আমাদের সাহিত্যের বরণীয় লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে জ্ঞানপীঠ কর্তৃপক্ষ বিগত ২৫ বৎসরে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়াছেন। লেখকের 'গণদেবতা' বইটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। ..... তারাশঙ্কর নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ জীবিত ঔপন্যাসিক। তাঁর রচনা সমস্ত ভারতীয় ভাষাতে অনূদিত হওয়া উচিত। এবং সাহিত্য - আকাদেমীর দায়িত্ব হবে এই অনুবাদ বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় করে বিশ্বের দরবারে একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা শিল্পীকে পরিচিত করা। ভারতবর্ষকে জানতে হলে তারাশঙ্করের রচনা বিদেশীদের অবশ্যপাঠ্য। এই মহৎ শিল্পীকে আন্তরিক শুভ কামনা জ্ঞাপন করে আমরা তাঁর অব্যাহত শিল্প-দৃষ্টি ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।"

—অমৃত (সম্পাদকীয়) শুক্রবার - ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ সাল।

'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ১৫ই ও ১৬ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় এই জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তি বিষয়ক সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। নব ভারত টাইমস' পত্রিকায় ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে একই বিষয়ে সচিত্র সংবাদ মুদ্রিত হয়। পূর্বোক্ত সংবাদপত্রের আলোকচিত্রের পরিচয় লিপিতে লেখা হয় —

"Tarashankar Banerjee receiving award from Dr. Gopal Das Reddi - Governor of U.P. in New Delhi on Friday. Mr. S.P. Jain founder of award seen on left."

বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'নবভারত টাইমস' এর ১৯৬৮ সালের ৭ই জানুয়ারী সংখ্যায় একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, লেখাটির নাম ছিল - "গণদেবতা ও শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।" এটি লিখেছিলেন মদনলাল ব্যাস। ১৯৬৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর

তাঁরই লেখা নতুন দিল্লীতে 'দিশারী' নামে এক নাট্যসংস্থা কর্তৃক 'গণদেবতা'র নাট্যরূপ অভিনীত হয়। ১৮ই ডিসেম্বর (১৯৬৭) সোমবারের 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকায় তার সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে 'টাইমস অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এক বিশেষ-প্রতিনিধির সঙ্গে তারাশঙ্করের এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হয় ঐ পত্রিকায় ২৮শে জানুয়ারীর সংখ্যায়। এর একটি মাত্র প্রশ্নোত্তর এখানে উদ্ধৃত হল :—

Q. What do you think of writers' role in Present society?
Ans. What is needed is clear vision & an unbiased mind. Just because, I believe in something I should not allow that belief to cloud my judgement. True belief is like light which receeds darkness and illumines the future path. Also necessary is a deep love for all – deep Keenship with everything on earth from the minutest particle.

১৩৩৬ সালে 'রবিবাসর' নামে সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা হয়। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার সম্পাদক জলধর সেন এর প্রথম সভাপতি ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সভার অধিনায়ক পদে বৃত হয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রও একসময়ে এর সদস্য হয়েছিলেন এবং এর রাজনীতি-নিরপেক্ষ চরিত্র তারাশঙ্করকে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯৬৮ সালে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এর সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। তারাশঙ্কর এর সদস্য হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে ডঃ শ্রীকুমার-বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে তাঁকে এর সদস্যপদ দেওয়া হয়। ১৯৬৭ সালে তারাশঙ্কর জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ করলে রবিবাসরের পক্ষ থেকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে একটি মানপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সন্তোষ কুমার দে মশায় লিখেছেন — "সংহতি সম্পাদক সুরেন নিয়োগী তারাশঙ্করের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তিনিই উত্তর কলকাতায় কার্তিক বসু লেনে সাহিত্য প্রাণা শ্রীমতী সুনীতি গুপ্তার বাসভবনে ঐ অধিবেশনের আয়োজন করেন। পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত এবং বহুবর্ণে চিত্রিত মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধান সেই মানপত্রখানি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নিজহাতে তারাশঙ্করকে

অর্পন করেন। মানপত্রের ভাষায় এবং শ্রীকুমারের মুখনিসৃত ব্যঞ্জনায় তারাশঙ্কর বিশেষ ভাবে অভিভূত হন।"

সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে বঙ্গদেশবাসীর পক্ষ থেকে তারাশঙ্করকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় কলকাতায় মহাজাতি সদনে ১৩৭৩ (১৯৬৭) সালের ৮ই ও ৯ইশ্রাবণ তারিখে, এই অনুষ্ঠানে মঙ্গলাচরণ করেন প্রহ্লাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন ফণিভূষণ চক্রবর্তী এবং সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গিরিজারঞ্জন সেন ভাষণ দেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন 'শতভিষা' পত্রিকার সম্পাদক এবং তারাশঙ্করের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী নির্মলকুমার ধাঁ।

১৯৬৮ সালের একেবারে প্রথম দিকে (জানুয়ারী মাসে) ভারত সরকার তারাশঙ্করকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে সম্মানিত করেন। এই সংবাদ চিত্রসহ ২৫শে জানুয়ারী তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকা, বসুমতী এবং আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হলে সেখানে তারাশঙ্করকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই ঘটনার সচিত্র বিবরণ পরিবেশিত হয় ঐ সময়ের আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, বসুমতী, যুগান্তর, Times of India প্রভৃতি সংবাদপত্রে। টাইমস অফ ইণ্ডিয়ায় সংবাদ প্রকাশের তারিখ ২৯শে আগষ্ট ১৯৬৮। ২৫শে আগষ্টের বসুমতীতে লেখা হয় —

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবারকার সমাবর্তন উৎসবে প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক শ্রী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ নীলরতন ধরকে যথাক্রমে সম্মানসূচক ডি.লিট ও ডি.এম.সি উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।"

১৩৭৫ সালের কার্তিক সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকায় সংবাদ সাহিত্য বিভাগে এই প্রসঙ্গে লেখা হয় —

"বর্তমান বাংলা সাহিত্যের সর্বাগ্রগণ্য কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের সুনাম, তারাশঙ্করের মর্যাদা এবং আমাদের আনন্দ বর্ধিত করিয়াছেন। দীর্ঘ চার দশক অতি নিষ্ঠা সহকারে সারস্বত সাধনা করিয়া জীবন সায়াহ্নে তারা-

শঙ্কর এই দুর্লভ সম্মান লাভ করায় বাণীর মন্দিরে এক মূল্যবান অর্ঘ অর্পিত হইল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও শীঘ্রই তাঁহাকে ডি. লিট উপাধি দিবার আয়োজন করিতেছেন – এই সংবাদেও আমরা পরিতুষ্ট হইয়াছি। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে নিরঙ্কুশ পাশ্চাত্যের যুগে সত্য শিব সুন্দরের সাধনায় তারাশঙ্করের লেখনী অক্লান্ত থাকুক ইহাই আমাদের কাম্য।"

১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে আরও অনেকের সঙ্গে তারাশঙ্করকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯৬৯ সালের ৩০শে জানুয়ারীর স্টেটসম্যান পত্রিকায় লেখা হয় —

"At the special Convocation honorary doctorate degrees were conferred on seven men of Science, Literature and Engineering. The recipients were Dr. R. C. Majumder, Dr. N. Norman Brown - an eminent Indologist & Mr. Tarashankar Bandyopadhy."

এই সমাবর্তনে পৌরোহিত্য করেছিলেন পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ ডি. ডি. পোটডার।

১৯৬৯ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তারাশঙ্করকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধি প্রদান করা হয়। এর সচিত্র বিবরণ 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'স্টেটসম্যান' সহ সকল প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। একটি বাংলা সংবাদপত্রের সংবাদ ছিল এই রকম ঃ—

"ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর, কবি নজরুল, জসীমউদ্দীন, অমিয় চক্রবর্তীকে সম্মান সূচক ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করার জন্যই এই বিশেষ সমাবর্তন। তারাশঙ্কর অমিয় চক্রবর্তী উপস্থিত থেকে উপাধি গ্রহণ করেন।"

১৯৬৯ সালের ১৭ই ডিসেম্বর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য আকাদেমী' কর্তৃক ফেলো নির্বাচিত হন। এ বিষয়ে চিত্রসহ সংবাদ প্রকাশিত হয় ১৮ই ডিসেম্বরের আনন্দবাজার পত্রিকায়। ছবিতে যাঁদের দেখা যাচ্ছিল, তাঁরা হলেন — ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীবালা দেবী, এবং সূর্যনারায়ণ

দান। সংক্ষিপ্ত সংবাদটি ছিল নিম্নলিখিতরূপ —

"তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে আর মাত্র দুজন ভারতীয় সাহিত্য আকাদেমীর সম্মানিত সদস্য হয়েছেন – সেই দুজন মনীষী হলেন ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এবং চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী।"

পুষ্পস্তবকে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন —

"বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের মত তাঁর সাহিত্য প্রতিভা বাংলা ভাষার সীমা অতিক্রম করে আজ সারা দেশে বিকিরিত। তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাস ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে দেশের তাবৎ সাহিত্যরসিকদের কাছে সমাদৃত। যারা সবার পিছে, সবার নীচে, যারা সবার অধম, দীনের হতেও দীন, সমাজের সেই সব ছন্নছাড়া, সর্বহারা নীচুতলার লোকেদের অনুভবের কথা, তিনি যেমন তাদের চোখে দেখে তাদেরই ভাষায় বলতে পেরেছেন, তেমন আর কে পেরেছে? সুস্থায় সবিনয়ে আকাদেমীর সর্বোচ্চ সম্মান তাঁকে নিবেদন করতে পেরে আমরা গৌরবান্বিত বোধ করছি।"

১৩৭৬ সালে তারাশঙ্কর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। এ পদ ছিল যথার্থ সম্মানের এবং অসীম গুরুত্বসম্পন্ন। সভাপতি হিসাবে তিনি ছিলেন এই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের মঙ্গলকামী। সেসময় তাঁর বয়স যথেষ্ট বেশী হওয়া সত্ত্বেও পরিষদের সকল অধিবেশনেই উপস্থিত থাকতেন। অধ্যাপক হীরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন – "আমি ছিলাম সেখানকার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই তিনি (তারাশঙ্কর) আসতেন। দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হ'ত। একবার পরিষদের কয়েকজন নিম্ন বেতনের কর্মী বেতন বৃদ্ধির জন্য কার্যনির্বাহক সমিতির নিকট আবেদন পেশ করলে তিনি তাদের সমস্যা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেন। শোচনীয় আর্থিক অবস্থার জন্য পরিষদের তহবিল থেকে বেতনবৃদ্ধির অতিরিক্ত ভার বহন করা সম্ভবপর না হওয়ায় তারাশঙ্কর ব্যক্তিগতভাবে নিম্ন দায়িত্বে প্রত্যেক কর্মীর জন্য অতিরিক্ত মাসিক দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি করেন এবং নিজেই এই অর্থদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। একজন মধ্যবিত্ত সাহিত্যিকের পক্ষে এমন আর্থিক ভারবহন যে কতখানি কঠিন কাজ, তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারবেন।

১৯৭১ সালে অর্থাৎ তাঁর জীবনের শেষ বৎসরে আরও দুয়েকটি সম্মান প্রাপ্তির ঘটনা ঘটে। এই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "ডি.এল.রায় স্মৃতি বক্তৃতা" দিতে আহূত হয়েছিলেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তারাশঙ্করকে ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি "নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা" দিতে আহ্বান করেন এবং তারাশঙ্কর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তিনি লিখেছেন -"সেই অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ১৪ই ১৫ই ,১৬ই ও ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিশ্বভারতীতে নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতায় দ্বিতীয় বর্ষে আমি "রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী" বিষয়ে চারটি বক্তৃতা দিই।" এই বক্তৃতাগুলি পরে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে। এই গ্রন্থে সংযোজিত ভূমিকা রচনার তারিখ শ্রাবণ ১৩৭৮ এবং গ্রন্থটি প্রকাশের কাল সেপ্টেম্বর ১৯৭১ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথ ও ভারতবর্ষ' নামে এই গ্রন্থের শেষ রচনাটির লেখার সময় অবশ্য ১৯৬১ অর্থাৎ রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর বৎসর। বইটি সাহিত্য সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

সবশেষে তারাশঙ্করের মরণোত্তর সম্মানলাভের বিষয়টির উল্লেখ করতে হয়। আমাদের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি দান করেন ১৯৭১ সালের ১লা অকটোবর তারিখে। তিনি মৃত্যু বরণ করেন ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর। উক্ত উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত এ.এল.ডায়াস তারাশঙ্করের টালা পার্কস্থিত বাসভবনে উপস্থিতহয়ে তারাশঙ্করের স্ত্রী শ্রীযুক্তা উমা দেবীর হাতে অভিজ্ঞানপত্রটি অর্পণ করেন। এর কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :—

> "........আমাদের আকাঙ্খা ছিল পরবর্তী সমাবর্তনে রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথা শিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান অভিজ্ঞানে বৃত করব, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবনের সমাবর্তন আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তি জীবনের আবর্তনের মাঝখানে মৃত্যুর অন্তর্গতি এসে পড়ল। .... আমরা সেই মহান সাহিত্য স্রষ্টাকে আমাদের তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান অভিজ্ঞানে ভূষিত করতে চাই, আর নিয়ে যেতে চাই বাংলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান গৌরব তারাশঙ্করের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধস্থাপনের অবিনশ্বর গর্ববোধ।

.... সাহিত্যতীর্থের একানুচারী সাধক তারাশঙ্কর জীবন তীর্থেরও অক্লান্ত পরিব্রাজক । রাঢ় বঙ্গের পথ প্রান্তর, বন জঙ্গল, অসংখ্য বিচিত্র গ্রামীণ জনতা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দরদী হৃদয় থেকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছে সাধারণ মানুষের অসাধারণ ঐশ্বর্য নিয়ে । দেশ ও মানুষের এমন অনুরক্ত অকপট জীবন রূপায়ণ করেছেন যে কবি, একটি নূতন যুগসন্ধির মর্মবেদনাকে বাণীবদ্ধ করে চিরন্তন শিল্পমূর্তি দান করেছেন যে স্রষ্টা, তাঁর অপরিশোধ্য ঋণ আমরা শ্রদ্ধানত হৃদয়ে স্বীকার করি ।"

১লা অকটোবর ।
১৯৭১ ।

শ্রী পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
উপাচার্য — উঃ বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

॥ সাহিত্য সৃষ্টির শেষ পর্যায় ॥

জীবনের অনুর্বর পর্বে তারাশঙ্করের সাহিত্য সাধনা অব্যাহত থাকলেও সাহিত্য সৃষ্টি তত্থানি উল্লেখযোগ্য ছিল না । ১৯৫২ সালে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি — "আরোগ্য নিকেতন" প্রকাশিত হলে তাঁর খ্যাতি যেন সম্পূর্ণতা লাভ করে । পরে অর্থাৎ ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে এই বই রবীন্দ্র পুরস্কার ও আকাদেমী পুরস্কার লাভ করে । ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬০ পর্যন্ত নানা শ্রেণীর রচনা প্রকাশিত হয় । সে সবের মধ্যে 'পঞ্চগ্রাম' 'তামস তপস্যা' 'চাঁপাডাঙার বউ' অবশ্যই উল্লেখযোগ্য । ১৯৫১ সালে — প্রকাশিত 'আমার কালের কথা' নামের আত্মজীবনীমূলক স্মৃতিচারণ নিঃসন্দেহে একটি স্মরণযোগ্য রচনা । 'আমার সাহিত্য জীবন' এর প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব পরে প্রকাশিত হয় । ১৯৬২ সালের চীনের ভারত আক্রমনের পরিপ্রেক্ষিতে 'ভারতবর্ষ ও চীন' ১৯৬৩ সালে এবং 'মস্কোতে কয়েকদিন' (১৯৫৮) মস্কো ভ্রমণের কাহিনী । সাহিত্য সমালোচনা ও মতাদর্শ সমন্বিত রচনা হল ' সাহিত্যের সত্য' (১৯৬০) তাঁর ছোটগল্পের শ্রেষ্ঠ সংকলন 'গল্প পঞ্চাশৎ' এর প্রকাশকাল ১৯৬৩ সাল । উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৫২ সালে ' আরোগ্য নিকেতনের প্রকাশের কালে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' আত্মপ্রকাশ করে । জীবনের শেষ দশ বছরে তারাশঙ্কর কিছু সংখ্যক কিশোর সাহিত্য 'ভূত পুরাণ' 'পবিন সিংয়ের ঘোড়া' 'উত্তর কিষ্কিন্ধা কাণ্ড' ইত্যাদি রচনা করেন এবং 'ছায়াপথ' এর মত সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসের দিকেও তিনি মনোনিবেশ করেন । আর একটি

বৃহৎ রচনা – 'মঞ্জরী অপেরা' বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে স্মরণীয় । 'গন্না বেগম' (১৯৬৫) ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং 'জঙ্গলগড়' (১৯৬৩) ও 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৫) তে ইতিহাসের ছায়াপাত হয়েছে । 'ভুবনপুরের হাট' (১৯৬৪) তারাশঙ্করের শেষ পর্বের স্বকীয় ঐতিহ্য আশ্রয়ী উপন্যাস । আলোচ্য কালে তিনি কিছু আধুনিক বিষয় অবলম্বী উপন্যাস রচনা করেন । এগুলির মধ্যে 'কালরাত্রি' (১৯৭০) এবং 'একটি চড়ুই পাখী ও কালো মেয়ে' (১৯৬৩) উল্লেখযোগ্য । 'রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী' (১৯৭১) তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত ও নানা কারণে স্মরণীয় । তাঁর শেষ জীবনে কয়েকটি মৃত্যু জনিত শোক গভীর হৃদয় ক্ষতের সৃষ্টি করে । সামগ্রিকভাবে সাহিত্য সৃষ্টির পথ ত্যাগ করে ১৯৬৩ সালে তিনি চিত্রশিল্পী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন ।

॥ জীবনাবসান ॥

১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী কালে তারাশঙ্কর তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে উপনীত হলেন । কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁর অন্তরের গভীরে পরপারের জন্য যে তৃষ্ণা ও আর্তি দেখা গিয়েছিল তার নিবৃত্তির সুযোগ এল অবশেষে । মৃত্যুর জন্য একটা মানসিক ~~পূর্বচিহ্ন~~ প্রস্তুতি ~~দেখে মনে [illegible]~~ তাঁর ছিলই । ব্যাপ্তির সিংহদ্বার অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠায় সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন সাহিত্য দরবারের সম্রাটের মত । তার পরিতৃপ্তির সীমারেখা অতিক্রম করে তাঁর যাত্রা আরও সমুখের দিকে যেখানে চিত্ত অধিকতর বিশুদ্ধির দিকে ধাবিত । ১৯৭১ সালের ২৯শে আগষ্ট তারাশঙ্কর অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন । পরবর্তী কিছু সময়ের জন্য তাঁর চেতনা লুপ্ত হয় । তারপর কখনও সচেতন আবার কখনও অচেতন এভাবেই ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে । অবশেষে রাত্রির অবসানে যখন ১৪ই সেপ্টেম্বরের প্রভাত এল, তখন ৬ – ২৪ মিনিটে তিনি জীবনের সীমারেখা অতিক্রম করে মহাজীবনের দিকে চিরকালের মত এগিয়ে গেলেন । তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা যুগের অবসান হ'ল – দেশের মানুষের চিত্তলোকে তখনও তাঁর উপলব্ধির সত্য উচ্চারিত ঃ

"আমি যা বিশ্বাস করি, তাকে আমি জীবনচর্যায় পরিণত করতে চেয়েছি আজীবন । এবং সাহিত্যের মধ্যে আমি তাকেই পরিবেশন করতে চেয়েছি ।"

॥ মৃত্যুর পরে ॥

(শোক বাণী ও অনুরঞ্জন)

এ যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু সংবাদ কলকাতা বেতার মারফৎ প্রচারিত হওয়ায় সমগ্র দেশ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তাঁর টালা পার্কের বাসভবনে খ্যাত অখ্যাত বহুবিধ মানুষ সমবেত হন। পুষ্পচন্দন শোভিত তাঁর মরদেহ নিয়ে এক সুবিশাল শোকমিছিল বহু পথ পরিক্রমার পর নিমতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্যের জন্য উপস্থিত হয়। কলকাতা বেতারকেন্দ্র এই মিছিলের অগ্রগমনের এবং শোকোচ্ছ্বাস কলকাতার সম্যক পরিচয় দানের জন্য এক ধারা বিবরণীর ব্যবস্থা করেন। সর্বাধিক লোকপ্রিয় সাহিত্যিকের মহাপ্রয়াণের সেই করুণ স্মৃতি দেশবাসীর মনে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

তারাশঙ্করের পরলোকগমনের পর দেশের নানা স্থানে স্মরণ সভার আয়োজন করা হয় এবং বিখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ তাঁদের মর্মবেদনা প্রকাশ করেন সংক্ষিপ্ত ভাষণে অথবা শোক বাণী পাঠিয়ে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তারাশঙ্করের অমর আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এখানে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থাপিত হল : —

॥ দেশ - সম্পাদকীয় - ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ ॥

"……মৃত্যু অতিবড় সত্য। এমন অবধারিতকে বিমুখ করা জীবজগতে সম্ভব নয়। কিন্তু, তার চেয়েও বড় সত্য জীবন। মৃত্যু জীবনের একটি পরম যতি। অথচ, জীবন একটি দীর্ঘ প্রবাহ। তারাশঙ্কর এই দীর্ঘ প্রবাহে আপন কৃতিত্বে এতই সমুজ্জ্বল যে, তাঁর মৃত্যু তাঁর জীবন সাধনায় ম্লান ও তুচ্ছ হয়ে গেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে আজ চল্লিশ বছরেরও বেশী বাংলা সাহিত্যে তিনি এমন একটি গৌরবের আসন অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন যা রবীন্দ্র পরবর্তী যুগে শরৎচন্দ্রের পর আর বুঝি কারও পক্ষে সম্ভব হয় নি। এই আসনে বসেই তিনি বিদায় নিয়েছেন।

……বলা বাহুল্য, তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যে কোথাও কোন রুগ্ন শৌখিনতার আশ্রয় নেন নি। ভারতীয় সমাজ, তার সংস্কৃতি, তার ধর্মাধর্মবোধ শিল্পী তারাশঙ্করকে পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করেছিল। তিনি ভারতীয় আত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, বিশ্বাস করেছিলেন - জীবনের সার সত্য জীবনেরই সুকর্মে মানবধর্মের

প্রতি প্রগাঢ় প্রেমে ও ধর্মবোধে । তাঁর রচনায় শাক্ত ও বৈষ্ণব বাংলার আশ্চর্য সমন্বয় দেখি ।

.....এই অস্থির চপল অবিশ্বাসের দিনে তাঁর কীর্তি অনুধাবন করা সহজ নয় । তাতে কার কী দুঃখ, সেই কীর্তিমান শিল্পীর ত নয়ই ।

.....সাহিত্যজীবনের অতিরিক্ত যে জীবনটি তাঁর ছিল, সেখানেও তিনি অভিভাবকের মতন এই বয়সেও সকল কর্তব্য পালন করেছেন । সাহিত্যিক সমাজের দুঃখের দিনে হোক,অথবা সাধারণ মানুষের দুর্গতির দিনে হোক – এই বৃদ্ধ মানুষটি-কে আমরা সদাব্যস্ত ছুটে আসতে দেখেছি । স্নেহ, প্রীতি, বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছা দিয়ে তিনি আমাদের ব্যক্তিগতভাবে ঋণী করে রেখে গেছেন । আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই , প্রণাম জানাই তাঁকে ।"

॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥

তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে যখন এসেছিলেন, তখন সাহিত্য জগতে মোড় ফেরবার সময়, সেই মোড় যে কয়জন ফিরিয়েছিল তার মধ্যে তারাশঙ্কর অন্যতম – বোধ করি প্রথমজন ।

॥ বনফুল ॥

আমাদের সাহিত্য সাধনার প্রথম যুগে যে বহুবিচিত্র স্বপ্নলোক আমরা সৃষ্টি করেছিলাম, তারাশঙ্কর একদা সেই স্বপ্নলোকের অধিবাসী ছিল ।

॥ মনোজ বসু ॥

আমাদের সাহিত্য পরিবারের কর্তা ব্যক্তি আজ চলে গেলেন । ভালবাসা, অমায়িকতা, ঔদার্য ও অমিয় সাহিত্য প্রীতি মিশিয়ে যে মানুষটি ছিলেন, তাঁর কথা প্রতিদিন মনে পড়বে । এতদিনের এত স্মৃতিকথা হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করছে । গত ত্রিশ বছরে সাহিত্য জগতে তাঁর যে আসন ছিল, তা শূন্য হয়ে গেল ।

॥ সন্তোষ কুমার ঘোষ ॥

সেই ১৯৪১ ,আর এই ১৯৭১ মাঝখানে ঠিক ত্রিশ বৎসর । আরও একবার মহাগুরু নিপাত, আমাদের দুর্বৎসর । তারাশঙ্কর । সাহিত্যের মেলায় শুধুই মনোহারী

বিভাগীয় বিপত্তি যিনি জ্বেলেন নি, সম্ভবত:আমাদের সর্বশেষ সার্বভৌম লেখক তিনি। তবু শোক নয়। মৃত্যু শূন্যতা সৃষ্টি করে ঠিক, কিন্তু পরিপূর্ণ এক পবিত্রতাও দেয়। আজ সারাদিন ধরেই দেখলাম, ওই যে তিনি চলেছেন, চলে গেলেন মর জীবন থেকে অমর জীবনে। 'ধাত্রী দেবতা'র স্রষ্টা তারাশঙ্কর। দেবতা নেই, ধাত্রী ও রইলেন, যাকে তিনি সবচেয়ে ভালবেসেছিলেন। শোক কেন?'

॥ গৌর কিশোর ঘোষ ॥

বাংলার আবহমান কৃষিভিত্তিক গ্রাম জীবনে যন্ত্র যে এক নতুন ধরণের পরিবর্তন ঘটাতে যাচ্ছে, তার আভাস তারাশঙ্করের চৈতন্যতেই আগে ধরা পড়েছে। গ্রামের যে মানুষ কলে বা জংশন স্টেশনে খেটে মাস মাস বেতন পায়, তাদের চরিত্র গ্রামের বাবুদের জমিতে খেটে খাওয়া মানুষদের চেয়ে যে স্বতন্ত্র, তারা যে জমির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা দাসভাব থেকে মুক্ত, তারা যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বোধে উদ্বুদ্ধ এক নতুন ধরণের মানুষ, যেমন কবির 'পঞ্চগ্রাম'এর রাজন, বা 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'য় করালী – এই বার্তা বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্কর যেমন ভাবে জানিয়েছেন, তেমন আর কেউ না। আমার কাছে এই কারণেই তারাশঙ্কর বড় লেখক।

॥ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥

সমাজের অবহেলিত ,অবজ্ঞাত মানুষদের অসাধারণ মূল্য দিলেন তারাশঙ্কর। স্বামী বিবেকানন্দের নতুন ভারতবর্ষ গড়ার আদর্শ নতুন করে তাঁর মধ্যে দেখা দিল।

মরণোত্তর অনুষ্ঠান – কলকাতা তথ্য কেন্দ্র স্মরণ সভা
৯ই অক্টোবর – ১৯৭১
তথ্য উৎস: আনন্দবাজার পত্রিকা – ১০ই অক্টোবর ১৯৭১

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে শুদ্ধ প্রীতি ও ভালবাসা এবং তাঁর – মানবিকতা ও সাহিত্যকর্মের জন্য ঋণ স্বীকারের মধ্য দিয়ে শনিবার তারাশঙ্কর স্মরণ সভা স্মরণীয় হয়ে ওঠে। তাঁর নামে উদ্যান, সরণি, কলকাতায় তাঁর মর্মরমূর্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর নামে বিশেষ বৃত্তি ও অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করে তাঁর স্মৃতি রক্ষার প্রস্তাব নেওয়া হয়। এজন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হওয়ার অনুরোধ করা হয়।

দুই বাংলার সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের উদ্যোগে কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে আয়োজিত এই সভায় শ্রী বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) পৌরোহিত্য করেন। নবীন ও প্রবীণ সহযাত্রী সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগীদের উপস্থিতিতে সভাকক্ষটি ভরে যায়। গলকে যিনি দেবতার আসনে বসিয়েছেন, সেই তারাশঙ্করের মৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সাধারণ মানুষও বাদ নেই। তারাশঙ্করের মত সাহিত্য শিল্পীর জীবদ্দশায় তাঁর জীবন নিয়ে কোন ডকুমেন্টারী ফিল্ম বা তথ্যচিত্র তোলার চেষ্টা হয় নি বলে সভায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়। ভবিষ্যতে যাতে অন্য কোন মহান শিল্পী সম্পর্কে এরকম ভুল না হয়, সেজন্য শিল্পী সাহিত্যিকদের সরকার ও অন্য কর্তৃপক্ষকে বলার জন্য উদ্যোগী হতে অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্য ও শিল্পী সাহিত্যিকদের বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। শ্রী সন্তোষ কুমার ঘোষ ও শ্রী সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার যুগ্ম আহ্বায়ক নির্বাচিত হন।

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের সময়োপযোগী তিনটি রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে সভায় কাজ শুরু হয় এবং শ্রী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তারাশঙ্কর রচিত গান দিয়ে শেষ হয়। সভাকক্ষের বাইরের দেওয়ালে তারাশঙ্করের আঁকা কয়েকটি ছবি সাজানো থাকে। তার মধ্যে একটি তাঁর নিজের হাতে নিজের রঙিন ছবি - ষাট বছর বয়সে। এছাড়া আকাশ বাণীর সৌজন্যে তারাশঙ্করের সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি রেডিও সাক্ষাৎকার বাজিয়ে শোনান হয়। আর তারাশঙ্করের বড় ছেলে শ্রী সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিকের দিনলিপি থেকে তিনদিনের বিবরণ পড়ে শোনান। সেই বিবরণীতে তারাশঙ্করের রসবোধ, তাঁর জীবনদর্শন এবং বিশেষ করে মানুষের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

॥ শোক প্রস্তাব ॥

সভার সভাপতি বনফুল এই শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন - "যুগসন্ধিকালের লেখক ও যুগদ্রষ্টা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে। যতদিন বাঙালী জাতি আছে, বাংলা সাহিত্য আছে - ততদিন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের এই শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী এবং বাঙালী জীবনের সকলতম রূপকার তাঁর বিচিত্র রচনা-সম্ভারের ভিতর দিয়ে অমর হয়ে থাকবেন। আমাদের সাহিত্য জগতের এই মহান

মুক্তা আজ জীবন মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে অমৃতলোকে অধিষ্ঠিত। আজকের এই স্মরণসভায় মিলিত হয়ে আমরা তাঁর অমর আত্মার প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি।"

॥ সূত্র নির্দেশ ॥

১। আমার কালের কথা (২য় সংস্করণ) – পৃষ্ঠা ২১

২। ঐ – পৃষ্ঠা ৪০

৩। সজনীকান্ত দাস ও রঞ্জন কুমার দাস – শনিবারের চিঠি – কার্তিক ১৩৭৮ পৃঃ ৭৮

৪। কৈশোর স্মৃতি – তারাশঙ্কর – পৃঃ ১১৩

৫। ঐ – পৃঃ ৭৪

৬। সাহিত্যের মত্য – তারাশঙ্কর – পৃঃ ৭৫

৭। শনিবারের চিঠি – কার্তিক ১৩৭৮ – পৃঃ ৮০

৮। আমার সাহিত্য জীবন (১) (১৩৭৬) – তারাশঙ্কর – পৃঃ ১৩৮

৯। শনিবারের চিঠি – তারাশঙ্কর সংখ্যা – পৃঃ ১০১

১০। বাংলা সাহিত্যে মোহিতলাল (১ম সং) – আবদারুউদ্দীন – পৃঃ ৫০

১১। আমার কথা তারাশঙ্কর (পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত)

১২। ঐ

১৩। ঐ

১৪। শনিবারের চিঠি – তারাশঙ্কর সংখ্যা (১৩৭৮) পৃঃ ৯৭